৩য় খন্ড
জহুরীর
জাম্বিল
জহুরী

জহুরীর জাম্বিল

তৃতীয় খণ্ড

জহুরী

একমাত্র পরিবেশক

তাসনিয়া বই বিতান, ৪৯১/১, বড় মগবাজার
ওয়ারলেস রেলগেট, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৮৩৫৪৩৬৮
মোবাইল : ০১৭২-০৪৩৫৪০

রেদোওয়ান প্রকাশন

www.pathagar.com

জহুরীর জাম্বিল– তৃতীয় খণ্ড

প্রকাশিকা : মোসাম্মাৎ মুর্শিদা খাতুন
পূর্ব ক্যানাল পাড়
খাজানগর, জগতি
জেলা-কুষ্টিয়া।

প্রথম প্রকাশ : জুন, ২০০৪ সাল

কম্পোজ : সাফওয়ান কম্পিউটার
৪৩৫, ওয়্যারলেস রেলগেট
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ০১১-০৬৫৬৯০

প্রচ্ছদ : মাহফুজুল হক হান্নান

বাঁধাই : ভাই ভাই বুক বাইন্ডার্স
৪৭, গ্রীনওয়ে বড় মগবাজার
ঢাকা-১২১৭

মূল্য : ৮০.০০ (টাকা)

[সর্বস্বত্ব লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত]

জহুরীর লেখা
প্রকাশিত সব
বই তাসনিয়া বই
বিতানে পাওয়া
যায় বিশেষ
কমিশনে

www.pathagar.com

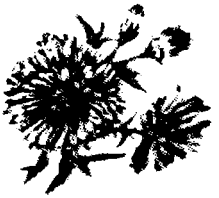

সৈয়দ আব্দুল কাদির

● নৌবাহিনীর সাবেক (অবঃ) এক অফিসার

● তার ও আমার জন্ম একই খান্দানে

● তিনি আমার অগ্রজ তাই আমি অনুজ

● তার স্নেহ ও ভালবাসার ঋণে আমি আকণ্ঠ নিমজ্জিত

● আমার লেখার তিনি আগ্রহী নিষ্ঠাবান পাঠকও

● তারই মোবারক হাতে এই পুস্তকখানা দিলাম শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ।

স্নেহধন্য ছোট ভাই

জহুরী

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
১. দেশের উন্নতি চাই, তবে	৭
২. নীল রক্তের মানুষ	১৫
৩. সংবর্ধনা মানে তেল ঢালা	২৪
৪. মুদ্রাদোষ	৩৪
৫. যে বয়সে শিশুরা বলে 'বুক্কু'	৪৫
৬. যত গুড় তত কি মিষ্টি হয়?	৫২
৭. পলিটিক্স	৫৯
৮. আমরা পিএইচডি করেছি বটে–	৬৮
৯. 'মুসলমান হলে কী হবে মানুষটি কিন্তু ভাল'	৭৪
১০. যেমন কলিকাতা তেমন ঢাকা	৮৩
১১. ঈদের ছুটি কত দিন?	৮৯
১২. বিয়ে-শাদী-হাঙ্গা-ম্যারেজ	৯৪
১৩. আব্রাহাম লিংকন : খুনীর পিস্তল	১০০
১৪. ডঃ নীলিমার অন্তিম ইচ্ছা	১০৬
১৫. ইফতার পার্টি : ইফতার রাজনীতি	১১৪
১৬. বাংলাদেশ কাঁপানো কয়েক ঘণ্টা	১২৬
১৭. হাইকোর্টের রায় : পতিতাবৃত্তি বৈধ	১৩৬
১৮. বলশেভিক বিপ্লবে ইহুদী ভূমিকা	১৪৫

www.pathagar.com

লেখকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ। জহুরীর জাম্বিল তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হলো। স্বনির্বাচিত কিছু নিবন্ধ নিয়ে এর প্রকাশ। পাঠকপ্রিয়তা পাবে বলে আমার বিশ্বাস। কোন নিবন্ধই আমি হালকা আলোচনা করে ইতি টানিনি। প্রত্যেক নিবন্ধে তথ্য আছে, তত্ত্বও আছে এবং পাঠকদের পঠন-আগ্রহ ও পঠন-স্বাদ যাতে কোন অবস্থায় ব্যাহত না হয়, তেমন রস-ধারাও পরিবেশন করার চেষ্টা করেছি ভাষায় রম্য স্টাইল এনে। সূচি দেখলেই বুঝতে পারবেন। দু'একটি নিবন্ধ পাঠ করলেই আমার অভিমত সঠিক বলে মনে হবে।

কোন কোন পত্র-পত্রিকায় কোন কোন নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু অধিকাংশই প্রকাশিত হয়নি। আর সকল পাঠক সকল নিবন্ধ পাঠ করার সুযোগও পাননি। তাছাড়া পত্রিকা থেকে গ্রন্থে গ্রন্থনা করতে গেলে যে মেহনত করতে হয়, তার পূর্ণরূপ পাঠক বইতেই দেখতে পাবেন। মাজাঘষায় যে পরিচ্ছন্নতা আসে, তার আলাদাই রূপ। সে রূপ দেখবেন বলে আশা করি। জনাব মোহাম্মদ আব্দুর রব, জনাব মাহফুজুল হক হান্নান ও জনাব শাহাদাত হোসেন-এই তিনজনের সহযোগিতা সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছি।

আল্লাহ এই মেহনত কবুল করুন, তার কাছে আমার মোনাজাত। সম্মানিত পাঠকদের জানাই সালাম।

জহুরী

স্থায়ী ঠিকানা	যোগাযোগ ঠিকানা
গ্রাম ও ডাকঘর-কদমরসুল	৪২৩ এলিফ্যান্ট রোড
থানা-গোলাপগঞ্জ	বড় মগবাজার
জেলা-সিলেট	ঢাকা-১২১৭

www.pathagar.com

দেশের উন্নতি চাই, তবে–

মনীষীদের কথা, দেশের কাছে কিছু চাইবার আগে নিজেকে জিজ্ঞাসা করে দেখ, তুমি এ পর্যন্ত দেশকে কি কিছু দিয়েছ? ব্যাংক থেকে টাকা উঠাতে যাও, ভাল কথা, প্রয়োজন থাকলে অবশ্য উঠাবে, কিন্তু ভেবে দেখ টাকা উঠাবার মত ব্যাংকে কি কিছু সঞ্চয় করে রেখেছ? কুড়াল হাতে নিয়ে গাছ কাটতে যাচ্ছ, জিজ্ঞাসা করি জীবনে তুমি একটি গাছও কি লাগিয়েছ? দেশকে কিছুই দিচ্ছ না, অথচ দেশের বুক যে তুমি শূন্য করে নিজেই মহাজন হতে যাচ্ছ। না, তা হওয়ার অধিকার তোমার নেই। আগে তুমি ত্যাগের অভ্যাস কর, তারপর দেশই তোমাকে না চাইতেই দেবে। তখন দেশ থেকে গ্রহণ করার তোমার নৈতিক অধিকারও থাকবে। সারা মাস এখানে ওখানে ঘুর ঘুর, এ দরজায় ও দরজায় সালাম, তোয়াজ এবং তোষামোদ, মাস শেষে মাহিনা নেয়ার লাইনে প্রথম। অপরের জন্য ত্যাগের লম্বা লম্বা আবেগময় বক্তৃতা আর নিজের জন্য অর্জন আর অর্জন, তা হতে পারে না।

www.pathagar.com

দেশের উন্নতি চাই, তবে–

আমরা সবাই দেশের উন্নতি চাই। তবে তা হোক আমার থেকে শুরু, এটাই প্রায় প্রত্যেকের মনের কথা। মনের এই কথাটা তো প্রকাশ করা যায় না, তাই মনের কথা মনেই থাকে। দেশের উন্নতির কথা উঠলে আমিও তা সমর্থন করি, কিন্তু উন্নতির কর্মটা শুধু নিজেরই জন্য করি। উন্নতি তো চাই বটে, কিন্তু কার উন্নতি; উন্নতিটা প্রথমে কার? আমার, আপনার, না দেশ ও জাতির? আমরা যে যেখানে যে কর্মক্ষেত্রে আছি, আগে এই কর্মক্ষেত্রের উন্নতি, না আগে আমার উন্নতি? আগে আমার সংসার, অতঃপর দুনিয়ার তাবৎ সংসার? সুতরাং উন্নতির উদ্দেশ্য বিধেয় আগে ঠিক করা চাই। দলের উন্নতি, জাতির উন্নতি এবং দেশের উন্নতি আগে, না আগে আমার আর মামাদের উন্নতি? কঠিন প্রশ্ন। এ প্রশ্নের কোন সমাধান হচ্ছে না। আত্মজিজ্ঞাসার দ্বারা যার সমাধান হতে পারতো, তা মাঠ-ময়দানের বক্তৃতায় চলে গেছে। ময়দান থেকে বক্তৃতা আর ঘরে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে না। জাতীয় সংসদে বসেও প্রত্যেককে জাতীয় উন্নতির জন্য পেরেশান থাকতে দেখা যাচ্ছে, অন্তত তাদের বক্তৃতা-বিবৃতি শুনলে তাই মনে হয়। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় বলতে হয় রহিম শেখ আর রমা কৈবর্তদের নিয়ে যে দেশ, তাদের কোন উন্নতি দেখছি না। মনীষীরা বলেন, দেশের কাছে কিছু চাইবার আগে নিজেকে জিজ্ঞাসা করে দেখ, তুমি এ পর্যন্ত দেশকে কি কিছু দিয়েছ? ব্যাংক থেকে টাকা উঠাতে যাও, ভাল কথা, প্রয়োজন থাকলে অবশ্য উঠাবে, কিন্তু ভেবে দেখ টাকা উঠাবার মত ব্যাংকে কি কিছু সঞ্চয় করে রেখেছ? কুড়াল হাতে নিয়ে গাছ কাটতে যাচ্ছ, জিজ্ঞাসা করি জীবনে তুমি একটি গাছও কি লাগিয়েছ? দেশকে কিছুই দিচ্ছ না, অথচ দেশের বুক যে তুমি শূন্য করে নিজেই মহাজন হতে যাচ্ছ। না, তা হওয়ার অধিকার তোমার নেই। আগে তুমি ত্যাগের অভ্যাস কর, তারপর দেশই তোমাকে না চাইতেই দেবে। তখন দেশ থেকে গ্রহণ করার তোমার নৈতিক অধিকারও থাকবে। সারা মাস এখানে ওখানে ঘুর ঘুর, এ দরজায় ও দরজায় সালাম, তোয়াজ এবং তোষামোদ, মাস শেষে মাহিনা নেয়ার লাইনে প্রথম। অপরের জন্য ত্যাগের লম্বা লম্বা আবেগময় বক্তৃতা আর নিজের জন্য অর্জন আর অর্জন, তা হতে পারে না।

www.pathagar.com

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নন্দলাল দেশের উন্নতির জন্য জীবন দেয়ার পণ করেছিল। সে দেশ উদ্ধারের জন্য শপথ গ্রহণ করেছিল। এ জন্য সে প্রচুর বাহবাও কুড়িয়েছিল। লোকজন নন্দকে বললো, যাও না তুমি ভাইয়ের সেবা কর, সে কলেরায় মরছে। নন্দ বলেছিল, ভাইয়ের সেবা তো ভাল কাজ, কিন্তু ভাইয়ের সেবা করতে গিয়ে যদি নিজের প্রাণটা যায়; তাহলে অভাগা দেশের হবে কি? দেশের জন্যই আমার বাঁচার দরকার। একবার সে একটা কাগজ বের করে সাহেবকে গালি দিয়ে বসলো। সাহেব এসে তার গলা টিপে ধরেন। নন্দ বললো, আ-হা-হা! কর কি, কর কি; ছাড় না ছাই, কি হবে দেশের, গলা টিপুনিতে আমি যদি মারা যাই?

কবির ভাষায়–

নন্দ বাড়ির হ'তনা বাহির
কোথা কি ঘটে কি জানি;
চড়িত না গাড়ী, কি জানি কখন
উল্টায় গাড়ীখানি;
নৌকা ফি সন ডুবিছে ভীষণ,
রেলে 'কলিশন' হয়;
হাঁটিতে সর্প, কুক্কুর আর
গাড়ি চাপা পড়া ভয়;
তাই শুয়ে শুয়ে কষ্টে বাঁচিয়ে
রহিল নন্দলাল।
সকলে বলিল–ভ্যালা রে নন্দ,
বেঁচে থাক চিরকাল।

www.pathagar.com

দ্বিজেন্দ্রলালের নন্দলালরা ঘর থেকে বের হতো না, কিন্তু আমাদের দেশ উদ্ধারের আধুনিক নন্দলালরা এক মুহূর্তও ঘরে বসে থাকেন না। দেশ উদ্ধারের জন্য ভীষণ ব্যস্ততা নিয়ে দেশের সর্বত্র আর বিশ্বের বহু দেশ ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আমরা তাদের এই ব্যস্ততা দেখে চিরকাল বেঁচে থাকার আশীর্বাদ করে থাকি। তাদের এই ব্যস্ততা দেশ উদ্ধারের জন্য, না নিজেকে ও নিজের পরবর্তী চৌদ্দগৌষ্ঠীকে উদ্ধারের জন্য, তেমন একটা খটকা বা প্রশ্ন মনে জাগে বটে।

অবশ্য দেশ উদ্ধারের নব্য নন্দলাল আর নন্দিনীরা কৈফিয়তের পাল্টাপাল্টি বাক্যবাণ ছুঁড়ে বলছেন, দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে চাই, দেশের অর্থনীতি চাঙ্গা করতে চাই, সমাজ থেকে সন্ত্রাস দূর করতে চাই, দুর্নীতির উৎখাত চাই, শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে চাই, জাতীয় ঐক্য চাই, জনগণের মুখে মাছ ভাত তুলে দিতে চাই, স্বাধীনতার সুফল প্রত্যেক পরিবারের ডাইনিং টেবিল পর্যন্ত পৌঁছাতে চাই এবং আরও বহু কিছু করতে চাই, কিন্তু বিরোধী দল কিছুই করতে দিচ্ছে না, পদে পদে বাধা দিচ্ছে। তা না হলে দেশের চেহারা পাল্টিয়ে দিতে পারতাম। বিরোধী দলও একই সুরে একই বক্তব্য রাখছে। তাদের বক্তব্যের সারকথা হলো এই, সরকারের ক্ষমতায় থাকার কোন যোগ্যতা নেই। এ সরকার সব দিকে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। ক্ষমতাটা আর একবার আমাদের হাতে আসলে দেশটাকে সত্যিকার অর্থে আমরা সোনারবাংলা করেই ছাড়বো।

উভয়পক্ষের বক্তব্য ডিএল রায়ের কবিতার 'রাজার' বক্তব্যের মত। রাজা বলেছিলেন, তিনি মস্ত একটা বীর হতে পারতেন, কিন্তু গোলাগুলির গোলে তার মাথা স্থির থাকে না। বারুদের গন্ধও তিনি পছন্দ করেন না। আর সংগীন খাড়া দেখলেই মনে লাগে দ্বন্দ্ব। তলোয়ার দেখলেই মনে হয় তার নিজের শিরহীন স্কন্ধের কথা। এভাবেই রাজা অনেক কিছু হওয়ার ও করার খেয়াল জাহির করেছিলেন আর পারিষদবর্গ রাজার প্রতিটি খেয়ালকে 'হ্যাঁ তা বটেইতো, তা বটেই তো' বলে উৎসাহিত করছিলেন। দুঃখের বিষয়, আমরা জনগণ কোন পক্ষকেই তাদের উচ্চারিত মনোবাসনাকে হাততালি দিয়ে 'বটেই তো, বটেই তো' বলতে

www.pathagar.com

পারছি না। কারণ, পেটে ক্ষুধা, সংসারের নানা ঝামেলা, নানা সমস্যা। দেশের উন্নতির নামে প্রায় প্রত্যেকেই নিজ নিজ উন্নতি নিয়ে ব্যস্ত।

মানুষের চলমান জীবনের ফাঁকে ফাঁকে রসের মণিখণ্ডগুলো লুকিয়ে থাকে। সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে সেগুলো ধরা পড়ে না। কিন্তু যিনি সেই মণিখণ্ডগুলো সুপটু হস্তে মার্জিত করে প্রকাশ্য আলোকে তুলে ধরতে পারেন, তিনিই তো যথার্থ রসিক। বঙ্গ সাহিত্যে কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন এমনি আর এক রসিক ব্যক্তি। নিজের উন্নতির তিনি যে এক রসকল্প চিত্রতার 'আই হ্যাজ' নামক উপন্যাসে এঁকেছেন, তা থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃতি হিসেবে পেশ করা যায়।

'হরগোবিন্দ বাবু বিচক্ষণ সাব জজ ছিলেন। ছেলে ননী গোপাল English-এ এম এ, First Class First.

ছোট লাট সাহেবের আশ্বাসে ছেলেকে সঙ্গে করে Interview-এ গেলেন। প্রথমে নিজে ঢুকে ভূমি স্পর্শ করে সেলামান্তে জানালেন, আপনাদের কৃপায় ছেলে এবার এমএ পরীক্ষায় ইংরেজিতে 1st Class 1st হয়েছে। সে সঙ্গে এসেছে। হুজুরের কাছে Deputy Mountainship-এর জন্য ভিক্ষা প্রার্থী। লাট সাহেব ছেলেকে দেখতে চাইলেন। সে দোর গোড়াতেই ছিল। বাপের কথা তার কানে যাচ্ছিল আর ভ্রূ-নাক মুখ বিষম কোঁচকাচ্ছিল। হরগোবিন্দ বাবু তাকে এনে লাটকে দেখিয়ে বললেন–

–It is I son sir,

লাট সাহেব বললেন– It is your son Haragobind, very very good. I shall see-he gets Deputy Mountainship.

হরগোবিন্দ সেলাম করে বললেন–'Your see' and our 'done' same thing, my lord.

ছেলে লজ্জায় মাথা হেঁট করে লাল মারছিল আর ঘামছিল। বেরিয়ে এসে বাঁচলো। তার রুষ্ট-বিরক্ত মুখ দেখে বাপ বললেন–

www.pathagar.com

'যদি হয় তো I son-এই হবে। তুই তোর ছেলের বেলায় myson বলিস, তাতে চাপরাসিগিরিও জুটবে না।'

অতি আত্মকেন্দ্রিক হরগোবিন্দরা মাইসান-কে আই সান বলে পরিচয় দিলেও উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয় ষোলআনা। ভাষায় ভুল থাকলেও আশায় ভুল নেই। প্রাপ্তিতেও বঞ্চনা নেই। এই হরগোবিন্দরাও উন্নতি চায়। তারা উন্নতি চায় 'আই' থেকে 'আই সান'। তারপর 'গ্রান্ড সান' পর্যন্ত এই ধারাবাহিকতায়। আধুনিক হরগোন্দিরা এই উন্নতির এই ধারাকে অনুসরণ করছেন।

কার উন্নতি কোন দিকে বলা মুশকিল। কেউ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে দেশ ও দেশের উন্নতি সাধনকল্পে সব টাকা হাতিয়ে নিয়ে ডিপোজিটরদের পথে বসান, কেউ শহীদের মা সেজে উদোরপিন্ডি বুদোর ঘাড়ে চাপিয়ে সূতায় টানা পুতুলের মত মাঠে-ময়দানে সন্ত্রাসী উল্লম্ফন নৃত্য করেন, তিনিও নাকি সমাজের উন্নতি চান। কেউ কেউ ১৯৪৭ সালের পূর্বাবস্থায় দেশটিকে ঠেলে নিতে পারলে মনে করেন দেশটির উন্নতি হবে, কেউবা বাংলাদেশের কবর খোঁড়ার মধ্যে চক্রান্তের সাফল্য তালাশ করেন। কেউ কেউ হয়তো ঐ মহারাজার মত দেশের উন্নতি চান, যে মহারাজা খরা আক্রান্ত প্রজাদের ধমক দিয়ে বললেন, দেশে খরা হয়েছে তো কি হয়েছে? আমার চৌবাচ্চা কানায় কানায় পানিতে ভর্তি। রাজা বাঁচলে তো দেশ বাঁচবে। তোমরা এ কথাটাও কেন বুঝ না?

সংসদে সংসদ সদস্যদের, মাঠে-ময়দানে নেতাদের ও মন্ত্রীদের সেমিনার, সিম্পোজিয়াম আর সুধী সমাবেশে বড় বড় বুদ্ধিজীবীদের বক্তৃতা শুনলে মনে হয়, তারা দশ ও দেশের উন্নতির জন্য বেকরার, পেরেশান। নির্বাচনের সময় দেখা যায়, 'অক্লান্ত সমাজকর্মী', 'গরীবের নয়নমণি', 'জাতির খাদেম', 'সমাজের একনিষ্ঠ সেবক' এবং 'জনকল্যাণে উৎসর্গীকৃত' নকল হাতেমতাঈ আর হাজী মোহাম্মদ মহসীনদের আবির্ভাব। সে সময় তাদের আগে কেউ সালাম দিতে পারেন না, তারাই প্রত্যেককে সালাম দেন আগে আগে। কোন এক নির্বাচনে সালাম দেয়ার দু'টি রসাত্মক খবর শুনেছি। একজন প্রার্থী কয়েক বারই ইউনিয়ন পরিষদের

www.pathagar.com

চেয়ারম্যান ছিলেন। তাঁর শখ হল তিনি এমপি হবেন, কিন্তু চোখে খুবই কম দেখেন। তাঁর নির্বাচনী এলাকার রাস্তাঘাট ভাল ছিল। তাঁরই এক কর্মীর মোটর সাইকেলের পিছনে চড়ে তিনি নির্বাচনী প্রচার ও জনসংযোগ শুরু করেন। মোটর সাইকেলের চালককে তিনি বললেন, আমি তোর মোটর সাইকেলে যখন থাকবো, তখন চলার পথে লোকজন দেখলে হর্ণ দিবি। তখন আমি বুঝতে পারবো, লোকজন সামনে আছে। আমি তাদের সালাম দেব। এভাবে চললো কয়েক দিন। একদিন এই প্রার্থী মোটর সাইকেলে এক বিরাট মাঠ পার হচ্ছিলেন। মাঠে ছিল অনেক গরু। চলার পথেও গরু বসে জাবর কাটছে। পথ থেকে গরু সরাবার জন্য চালক হর্ণ দিতে শুরু করেন। হর্ণ শুনে প্রার্থী ভাবলেন, সামনে নিশ্চয়ই লোকজন আছে। তাই তিনি মানুষ মনে করে গরুকে সালাম দিতে থাকেন। চালক তো হেসেই খুন। প্রার্থী তাকে হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। চালক বললো, আপনি যত সালাম দিয়েছেন, সবইতো গরুকে সালাম দিয়েছেন। এ জন্য হাসলাম। প্রার্থী বললেন, তাহলে তুই হর্ণ দিলি কেন? চালক বললো, হর্ণ না দিলে গরু তো পথ ছাড়ে না। প্রার্থী ধমক দিয়ে বললেন, গরুর পথ ছাড়ার জন্য হর্ণ দিচ্ছিস, তা তো আমাকে বলবি। এ কথা কাউকে বলিস না। গরুকেও সালাম দিতে হলো এই বুড়ো বয়সে। হায়রে কপাল! মানুষকে যে সহজে সালাম দেয় না, সে গরুকে সালাম দিল নির্বাচনের জন্য।

আর একটি ঘটনাও হাস্যরসাত্মক। প্রার্থী যাকে পান তাকে সালাম দেন। প্রার্থীর এক চামচা বললো, স্যার এক কাজ করুন। আপনি সালাম দিতে দিতে হয়রান হয়ে যান। আমি টেপ রেকর্ডার আনি। আপনি অন্তত দুইশত সালাম রেকর্ড করে ফেলুন। আমি আপনার সাথে যেখানে যাব, সেখানে নিয়ে যাব টেপ রেকর্ডার। যখনই লোক দেখবো তখন রেকর্ডার অন করে দেব। তাহলে আপনার সালাম দেয়া হয়ে যাবে। প্রার্থী ধমক দিয়ে বললেন,হিন্দু ভোটারদের জন্য কি আবার আদাবের রেকর্ড ক্যাসেট করবো? যেভাবে দিচ্ছি এভাবেই চলতে থাকুক। দিনে না হয় হাজারটা সালাম-আদাব দেব। তা সহ্য হবে। রেকর্ড-ফেকর্ড থাক।

www.pathagar.com

উন্নতির বাজনা বাজাচ্ছেন চৌদিকে যারা, উন্নত তারাই। উন্নতি হচ্ছে বটে তবে এদিকে না হয়ে ওদিকে, এখানে না হয়ে সেখানে। দেশের দশের উন্নতি না হয়ে হয়তো আই সান মাই সানদের উন্নতি হচ্ছে। শুকুর আলী মুদি বলেছিল, স্যার দোকানে আমার যথেষ্ট লাভ হয়েছে। প্রত্যেক জিনিসই লাভে বিক্রি করেছি। তবে সে লাভ আমার পকেটে না এসে কর্মচারীদের পকেটে চলে গেছে। কিছু গেছে ইঁদুর আর তেলাপোকার পেটে। দোকানে লাভ হয়নি এই বদনাম শুনতে আমি রাজি নই। তবে আমার দোকানের লাভ আমার পকেটে নেই। বাংলাদেশের উন্নতিও ঋণখেলাপী, ওয়াদা খেলাপী, দায়িত্ব খেলাপী, চোরাকারবারী, ঘুষখোর, গ্যাস, বিদ্যুৎ, পানিচোর ও তাবৎ দুর্নীতিবাজদের পেটে যাচ্ছে। কিন্তু উন্নতির বাজনার আওয়াজ শুধু বাড়ছে আর বাড়ছে। জাতীয় উন্নতির নম্বরটা যদি ব্যক্তিগত উন্নতির উপরে না হয়, তাহলে উন্নতির বাজনাই শুধু বাজবে। ব্যক্তিগত উন্নতি জাতীয় উন্নতিকে গিলে ফেলছে প্রায়।

www.pathagar.com

নীল রক্তের মানুষ

ব্রিটিশরা ৪০৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রোমানদের অধীনে ছিল। ৪০৭ সালে রোমানরা ব্রিটেন ছেড়ে চলে যায়। রোমান জেনারেলরা আত্মকলহে লিপ্ত হয়। এই ব্রিটিশরা ধীরে ধীরে সুসংঘবদ্ধ হয়। ইউরোপে শিল্প বিপ্লব ঘটার কারণে তাদের চোখ-মুখ খুলে যায়। অসভ্যরা সভ্য হতে থাকে। আমেরিকায় 'মে ফ্লাওয়ার' জাহাজযোগে প্রথমে ব্রিটিশরা অবতরণ করে। আমেরিকা তারা দখল করে নেয়। ধীরে ধীরে তারা আফ্রিকা ও এশিয়ায় দখলদারী বিস্তৃত করে। অস্ট্রেলিয়া তো তাদের ক্রিমিনালের দ্বারা ভরে তোলে। গোটা ভারতবর্ষ তাদের দখলে আসে। ১৯০ বছর আমরা তাদের প্রজা ছিলাম। তখনই আমরা ব্রিটিশদের চিনেছি, এই জাতটা কেমন। উভয় গোলার্ধে ছিল তাদের রাজত্ব। তারা দাবি করে, নীল রক্তের মানুষ।

www.pathagar.com

নীল তিমি সবচেয়ে বড় প্রাণী। এই বড়ত্ব দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে, উচ্চতায় তথা হরেক ক্ষেত্রে। দেহের রঙও নীল। বিশাল ও গহিন মহাসমুদ্রে নীল তিমি বাস করে।

ব্রিটিশ জাতিও এক সময় দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে, উচ্চতায় তথা নানা ক্ষেত্রে এতই বড় ছিল যে, তাদের রাজত্বে সূর্য অস্ত যেত না। বিশাল দুনিয়ার দুই গোলার্ধ ছিল তাদের দু'হাতের বেস্টনে। সূর্যের উদয় আর অস্ত তো এ জাতির ভূখণ্ডের চৌহদ্দির মধ্যেই ছিল। তাদের কেউ কেউ অহংকার বা কৌতুক করে বলতেন, 'সূর্যের উদয় আর অস্ত যখন আমাদের দখলী ভূবনেই হয়, তখন 'হ্যামসে বড়া কৌন হ্যায়'- 'আমাদের চেয়ে বড় কে'। সকলের রক্ত রক্তবর্ণ, কিন্তু আমাদের রক্ত নীল বর্ণ। এ জন্য তাদের কেউ কেউ নিজেদের বলতেন, আমরা নীল রক্তের মানুষ। নীল রক্তের জাতি। আসলে কি তাই?

আসুন না, এই নীল জাতিটার জন্মের খবরাখবর নিয়ে দেখি– কোন্ নীল সাগরের পানি পান করে তাদের রক্তের রঙ বদলেছে। হ্যাঁ, তাদের অনেকের রয়েছে নীল চোখ। এই নীলাভ রঙ শুধু তাদেরই চোখ ধারণ করেছে, তা নয়। বিশ্বের অনেক জাতির অনেকেরই নীল চোখ আছে। আলোচনা করেই দেখা যাক, তাদের অরিজিন কি। তাদের রক্ত কতটুকু নীল।

বৃটিশ, ব্রিটিশ : দু'ধরনের বানানেই British লেখা হয় বাংলা হরফে। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে লেখাপড়া না জানা বা কম জানা লোক বলেন 'বিটিশ'। ব্রিটেনের অধিবাসীকে আমরা ব্রিটিশ বলি আবার ইংরেজও বলি। ইংরেজকে কেতাবদোরস্ত ভাষায় বা স্টাইলিশ কায়দায় গোরাও বলা হয়ে থাকে। গোরাদের দেশ বলতে এক সময় আমরা ইংল্যান্ডকে মনে করতাম। গোরা শব্দটা এক সময় বাংলার কবি-সাহিত্যিকরাই লেখালেখিতে বেশি ব্যবহার করতেন। আজকাল এর প্রচলন নেই বললেই চলে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত এক উপন্যাসের নাম গোরা। গোরা মানে ফরসা, গৌরবর্ণ। ব্রিটেন এক সময় কেল্ট (CELT) জাতির

www.pathagar.com

শাসনাধীন ছিল। কেল্ট বংশজাত জাতিকেও ব্রিটিশ বলা হয়। তাদেরই এক পুস্তকে এভাবে লেখা আছে : British-Partaining to great Britain or its inhabitants, sometimes applied distinctively to the orginal celtic inhabitants. তাহলে কথাটা দাঁড়ালো এই, ব্রিটিশ জাতিকে চিনতে হলে CELTS-দের জানতে হবে। CELTS জাতির পরিচিতি হলো এই, কেল্ট মূলত অরণ্যবাসী ছিল অর্থাৎ সভ্যতার আলোছায়া তাদের ওপর পড়েনি। কালক্রমে তারা যখন তদানীন্তন সভ্যতার আলো পেতে শুরু করে, তখন তারা সুসংঘবদ্ধ হয়ে দেশ জয়ের অভিযানে বের হয়। হ্যাঁ, তাদের আদি বাস ছিল দক্ষিণ ও পশ্চিম ইউরোপে। ওদের ভাষায় ছিল স্পষ্টতা। ওরা যখন ব্রিটেন দখল করে, তখন ওদের গোটা গোত্রই ব্রিটেনে চলে আসে। তারাই ব্রিটেন আবাদ করে। ব্রিটিশরা CELTS-এর বংশজাত। কেল্টরা যখন ব্রিটেনে আসে তখন সময়টা ছিল ঈসা (আঃ)-এর জন্মের অনেক আগে। কেল্টদের আগমনের অনেক পরে অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব ৫৫ সালে জুলিয়াস সীজার তার বাহিনী নিয়ে ব্রিটেনের দক্ষিণ উপকূলে অবতরণ করেন। কিন্তু তার জাহাজটি ঝড়ের কবলে পড়ে ধ্বংস হয়ে যায়। ফলে অন্য জাহাজে চড়ে তিনি দেশে ফিরে যান। সে সময় তার দেশের নাম ছিল GAUL, বর্তমান নাম ফ্রান্স, আর তিনি ব্রিটেনে আসেননি। এরপর প্রায় শত বছরের মধ্যে রোমান আক্রমণের শিকার হয়নি ব্রিটেন। ৪৩ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট Claudius বিরাট বাহিনী Plautius-এর নেতৃত্বে ব্রিটেন দখলের জন্য প্রেরণ করেন। তখন ব্রিটেনে নানা গোত্রের বাস ছিল। তারা অসংগঠিত ছিল। ৬১ খ্রিস্টাব্দে লন্ডিনিয়াম (লন্ডন)-এর পতন ঘটে। ব্রিটেনে রোমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রিটেনের অধিবাসীর নাম দেয়া হয় CELTS বা ব্রিটিশ। ব্রিটেনের বাসিন্দাদের রোমানরা অসভ্য বলতো। কারণ, তারা ব্রিটেন দখল করে অসভ্যতার দৃশ্যই দেখেছিল। তখন ইংলিশ চ্যানেল ছিল না। ইউরোপের সঙ্গে ব্রিটেন একই স্থলভাগে ছিল।

এই ব্রিটিশরা ৪০৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রোমানদের অধীনে ছিল। ৪০৭ সালে রোমানরা ব্রিটেন ছেড়ে চলে যায়। রোমান জেনারেলরা আত্মকলহে লিপ্ত হয়। এই

www.pathagar.com

ব্রিটিশরা ধীরে ধীরে সুসংঘবদ্ধ হয়। ইউরোপে শিল্প বিপ্লব ঘটার কারণে তাদের চোখ-মুখ খুলে যায়। অসভ্যরা সভ্য হতে থাকে। আমেরিকায় 'মে ফ্লাওয়ার' জাহাজযোগে প্রথমে ব্রিটিশরা অবতরণ করে। আমেরিকা তারা দখল করে নেয়। ধীরে ধীরে তারা আফ্রিকা ও এশিয়ায় দখলদারী বিস্তৃত করে। অস্ট্রেলিয়া তো তাদের ক্রিমিনালের দ্বারা ভরে তোলে। গোটা ভারতবর্ষ তাদের দখলে আসে। ১৯০ বছর আমরা তাদের প্রজা ছিলাম। তখনই আমরা ব্রিটিশদের চিনেছি এই জাতটা কেমন। উভয় গোলার্ধে ছিল তাদের রাজত্ব। এ জন্য বলা হতো, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্যাস্ত হয় না।

এই ব্রিটিশ জাতিকে ১৯০ বছরে উপমহাদেশের লোকজন পশমে পশমে চিনেছে। এ জন্যই তো ব্রিটিশ পলিসি, ব্রিটিশ শাসন, ব্রিটিশ চালচলন আর ব্রিটিশ আচরণ সম্পর্কে অবিভক্ত ভারতবাসীর তিক্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে। সে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই বঙ্গবাসীরা অনেক যোগ-বিয়োগ করার পরও ব্রিটিশকে গ্রহণ করতে পারেনি। কোন বিশেষ কারণে যে গ্রহণ করতে পারছে না, তা কিন্তু নয়। অনেক কারণ একত্রিত হয়ে যে নিম্নচাপ সৃষ্টি করেছিল বঙ্গবাসীর মনে, তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটে এই জাতটার ওপর। কারণগুলো হচ্ছে এই, ওরা বঙ্গ ভাণ্ডার লুণ্ঠন করেছে, বঙ্গবাসীকে শোষণ করে নির্যাতন করেছে, হাজার হাজার লোককে হত্যা করেছে, নীল চাষীদের ওপর জুলুম করেছে, বঙ্গের ভাণ্ডার লুট করে ইংল্যান্ড গড়েছে, বঙ্গের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের কারাবন্দি করে জুলুম করেছে, বাংলার স্বাধীনতা শঠতা ও দূর্নীতি দ্বারা ছিনিয়ে নিয়েছে। ডিভাইড এন্ড রুল পলিসি এ দেশে প্রবর্তন করেছে, বাণিজ্য করতে এ দেশে এসে দেশটাই দখল করেছে, এ দেশে মীর জাফর, জগৎশেঠ, উমিচাঁদ গড়ার ফ্যাক্টরি তৈরি করেছে, বশংবদ কিভাবে সৃষ্টি করা যায় হাতে কলমে তারা সেই প্রশিক্ষণ দিয়েছে। ঘুষ, দুর্নীতি, চোগলখুরী, মুনাফিকী, গিবত, চরিত্র হনন আর অপবাদ রটানেরও বীজ বপন করেছে, বীজ থেকে চারা হয়েছে, চারা থেকে হয়েছে কিশলয়, এমন এক শিক্ষা ব্যবস্থা মেকলে সাহেব দ্বারা প্রবর্তন করিয়েছে তারা, যে শিক্ষা ব্যবস্থার গুণে বর্ণ ও চেহারায় বঙ্গবাসীকে বঙ্গবাসী

www.pathagar.com

দেখায় বটে, রক্তেও সে প্রমাণ মিলে, কিন্তু চরিত্রে, খাসলতে, সংস্কৃতিতে এবং আচার-ব্যবহারে 'ইংরেজ' করে রেখেছে, এ উৎপাদন চলছে ও চলতে থাকবে, ওরা আমাদের স্বাধীনতা লুণ্ঠনকারী, আমাদের হাতে-পায়ে আর বিবেকে পরাধীনতার শৃঙ্খল পরিয়েছিল, ওরা আমাদের ধূর্তামী, বদমায়েশী, মুনাফেকী ও সন্ত্রাস শিখিয়েছে, এ সবের কারণে কি বঙ্গবাসী ব্রিটিশদের বিশেষ বিশেষ সম্বোধনে সম্বোধন করে থাকে?

ব্রিটিশ জাতির মধ্যে অনেক গুণ আছে, কিন্তু ১৯০ বছর তাদের শাসনে ভারতবাসী বিশেষ করে বঙ্গবাসী থাকার কারণে তিক্ত অভিজ্ঞতা যা অর্জন করেছে তাতে ব্রিটিশদের বহুমুখী গুণ বঙ্গবাসীর চোখের সামনে ভাসে না। ভাসে তাদের বহুমুখী বদগুণের মিছিল যা তারা প্রয়োগ করেছিল 'নেটিভ'দের ওপর। ব্রিটিশদের বহুমুখী গুণ তো ব্রিটিশদের জন্য, তাদের প্রয়োজনেই প্রয়োগ হয়েছে, কিন্তু তাদের এই গুণগুলো যখন বদগুণ হয়ে অন্যদের অভিমুখে ধাবিত হয়েছে, তখন ব্রিটিশ-প্রতিভা ইবলিসের ইবলিসী, শয়তানের শয়তানীকেও হার মানিয়েছে। এসব কারণে লাল রংয়ের বদন বিশিষ্ট সুন্দর চেহারার ব্রিটিশদের এখনও বঙ্গবাসী আপন করে নিতে পারছে না। ইতিহাস বাধা দেয়, আপন করে নিতে চাইলেও ইতিহাস তার পাতাগুলো সামনে তুলে ধরে। হ্যাঁ, ব্রিটিশদের জন্য একটা সুখবরও আছে, বঙ্গবাসী সকলে যে তাদের সমালোচক তা বলা যাবে না। রায়বাহাদুর, খান বাহাদুররা তো নয়ই এমন কি লক্ষাধিক বঙ্গবাসী যারা ইংল্যান্ডে কাজ করছে, চাকরি করছে তারাও নয়। আর নয় ওরা, যারা বঙ্গে বাস করেও মদ গিলে, ব্রিটিশ কালচার জীবন-যাপনে গ্রহণ করে নিয়েছে, নীল সায়রে নীল হয়ে আছে, সাঁতার কাটছে, আনন্দ করছে। তাদের ব্রিটিশ-প্রীতি অত্যধিক। যদিও ব্রিটিশদের দেশ আমাদের দেশের মতই। শুধু কালচারটা আর ফেরেববাজিটা আমাদের জ্বালাতন করেছে এবং এখনও করছে। ব্রিটিশরা যখন আমাদের দেশটা দখল করে নেয়, তখন আমাদের একটি শ্রেণী ব্রিটিশ প্রেমে গদ গদ হয়ে পড়ে। বিলাত থেকে আগত সব কিছুই তারা লোলুপ আগ্রহে লুফে নিত। তাদের বিলেতীপনাকে বিদ্রুপ করে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় লিখলেন :

www.pathagar.com

'এই বিলেত দেশটা মাটির, সেটা সোনা রুপোর নয়,

তার আকাশেতে সূর্য উঠে, মেঘে বৃষ্টি হয়।

তার পাহাড়গুলো পাথরের, আর নদীগুলো ছোটে,

তোমরা বোধ হয় বিশ্বাস এটা করছো না মোটে,

কিন্তু সব সত্যি সব সত্যি কথা ভাই,

তোমরাও যদি দেখতে তাহলে তোমরাও বলতে তাই।'

ডিএল রায় গোটা বিলাত মুল্লুকের ছবি তার কলম দিয়ে একে দেশবাসীর সামনে তুলে ধরে বলেছেন, বেহুদা এই প্রীতি, কিন্তু তার মত অনেকে লেখালেখি করেও বিলাত-প্রীতিতে অন্ধ, তাদের ফেরাতে পারেননি। ডিএল রায় তাই বিলাত প্রেমিক বঙ্গবাসীদের লক্ষ্য করে 'বিলাত ফের্তা' গান লিখেন। এই গানটির কয়েকটি পঙতি হলো এই :

'আমরা ছেড়েছি টিকির আদর,

আমরা ছেড়েছি ধুতি ও চাদর,

আমরা হ্যাট বুট আর প্যান্ট কোট পরে

সেজেছি বিলাতি বাঁদর।

আমরা বিলিতি ধরনে হাসি

আমরা ফরাসি ধরনে কাশি,

আমরা পা ফাঁক করে সিগারেট খেতে

বড্ড ভালবাসি।'

এত লেখালেখিতেও এক শ্রেণীর বঙ্গবাসীর বিলাতিপনা গেল না। অবশেষে তিনি হতাশ হয়ে বললেন, অন্যের অনুকরণে সময় ও অর্থ ব্যয় না করে তোমরাই নতুন কিছু কর, আর যদি কিছু করতে না পার তবে বউকে ধরে মারো।

www.pathagar.com

কেদারনাথ বন্দোপাধ্যায় ডিএল রায়ের চিন্তাধারার লোক ছিলেন। বিলাতি কালচার-ভক্ত ও অনুসারী বঙ্গীয় এক শ্রেণীর যুবকের উদ্দেশ্যে কেদারনাথ লিখলেন–

'সেই ফ্যাশনের চুল ছাঁটা সেই অলস্টার বুকে
টাই বাঁধা আর কলার আঁটা, সিগারেট মুখে,
হাতে ছড়ি চশমা পরা চোস্ত মোজা পায়
যুবা যত চিমনির মত ধোঁয়া ছেড়ে বেড়ায়।
পাশ দিয়ে যাও শুনতে পাবে-তিন ভাগ ইংরেজি,
বুঝতে পাবে মানে তার বহু ঘষি মাজি।
ব্যাকরণ বিভীষিকার হরদম বিষম লাগে,
ইংরাজের বীণাপানি বেগ পার্ডন মাগে।'

এ সব উদ্ধৃতি এ জন্যই দিলাম যে, কোন ব্রিটিশ যেন এই মনে না করেন যে, সব বঙ্গবাসী ব্রিটিশকে পছন্দ করে না। পছন্দ যে করতো এবং কিভাবে গভীর থেকে করতো, তারই কিছু দলিল-প্রমাণ দিলাম। এখনও ভক্তের সংখ্যা বেশুমার আর ব্রিটিশ কালচারের অনুরাগী ও অনুসারী তো কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সবাই। মুসলমানরাও বার্থডে অনুষ্ঠান করে, মোর‍্যাল আর ভাস্কর্যের নামে ঘরে মূর্তি রাখে, চাচা-চাচি বাদ দিয়ে আংকেল-আন্টি শক্তভাবে ধরেছে, নিজের নামটাও ইংরেজি ধাচে ফেলে লিখতে শুরু করেছেন অনেক মুসলমান। এ মন্তব্যের একটা ব্যাখ্যা দেয়া দরকার। বাবা-মা নাম রেখেছেন সন্তানের চৌদ্দহাত লম্বা। সন্তানকে বিদ্যালয়ে নেয়া হয়েছে ভর্তির জন্য। শিক্ষক ভর্তি ফরমে চৌদ্দহাত লম্বা নাম দেখে তো অবাক। অবাক হয়েছেন শিক্ষক শুধু লম্বা নাম দেখে নয়, তিনি পড়েছেন ভীষণ বিপদে। এই লম্বা নাম তিনি ভর্তি রেজিস্টারে কিভাবে জায়গা দেবেন? প্রায় অর্ধেক পৃষ্ঠাই তো এক ছাত্রের নাম লিখতে চলে যাবে। এরকম নামের যদি ৮/১০টা ছাত্র আসে, তাহলে তো ভর্তি খাতাই শেষ হয়ে যাবে। তাহলে উপায়? এই চিন্তা করে তিনি উপায় একটা বের করলেন। চৌদ্দহাত লম্বা নামের খণ্ড খণ্ড অংশের

www.pathagar.com

আদ্যাক্ষর নিয়ে মূল নাম ঠিক রেখে রেজিস্টারে তুললেন। ফলে নাম এ. কে. এম. টি. এস. ডি. এম. দিয়ে শুরু হলো, শেষও হলো শেষ শব্দে গিয়ে। এ সন্তান কোন দিন জানতে পারলো না এতটি ইংরেজি হরফে কিকি শব্দ হয়।কি প্রয়োজন শব্দে ভারী ও লম্বা নাম বহরের? সন্তানের ওপর এ ভারী বোঝা চাপিয়ে দেয়ার কি মানে আছে? আদ্যাক্ষরের সংখ্যাও তো কম নয়। আমি যদি বলি, এই লম্বা নাম-প্রীতি বা নাম-ফ্যাশন ইংরেজি অক্ষরের সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠার একটা কসরত মাত্র, তাহলে কি ভুল হবে? ব্রিটিশ প্রীতি মানে ইংরেজ প্রীতি। কেউ কেউ তো এফিডেভিট করে প্রথম দিকের লম্বা মিছিলকে বাদ দিয়ে ছোট করেছেন নিজ নিজ নাম। এমন দৃষ্টান্তও আমার কাছে আছে। কিন্তু যারা ব্যক্তিত্বে ও বিদ্যার দৌড়ে মোটেই আগে বাড়তে পারেননি, তারা নামের এই লম্বা লেজ নিয়ে নিশ্চয়ই বিপদে আছেন। পারতপক্ষে লেজ প্রদর্শন করেন না, অরিজিনাল নামটাই শুধু পেশ করেন।

সুতরাং ব্রিটিশ প্রীতি কেউ কেউ নামের মধ্যে ধারণ করে আছেন, যাদের নামে মোহাম্মদ বা মুহাম্মদ আছে তাদের মধ্যে খুব কম লোক ইংরেজিতে মোহাম্মদ বা মুহাম্মদ শব্দকে পূর্ণ বানানে লেখেন, এখানেও তারা সংক্ষেপ করেন Md. বা Mohd. লেখেন। বাংলায় তো 'মোঃ' বা 'মোহাঃ' দিয়ে কাজ সারেন। এ রেওয়াজ ব্রিটিশপ্রীতির অন্তর্ভুক্ত কিনা ভেবে দেখবেন? মোট কথা, এসব হচ্ছে ব্রিটিশপ্রীতির নমুনা, কেউ স্বীকার করুন আর নাই করুন, আমি তো তাই মনে করি যা এতক্ষণ বললাম।

এবার আর এক প্রসঙ্গে আসি। ব্রিটিশ ভক্তির লোক আছে তাতো বললাম আবার ব্রিটিশ অভক্তির লোকও আছে তাদের কথাও কিছুটা আলোচনা করা যাক।

বাংলাদেশের শিক্ষিত বা অশিক্ষিত অথবা স্বল্প শিক্ষিত লোকদের কাছে 'ব্রিটিশ' শব্দটি চালাকি, ধূর্তামি, কূটবুদ্ধি ও ধান্ধাবাজির প্রতীকী শব্দ। আমি যে ভুল বলিনি, সাক্ষী আপনারাই অর্থাৎ সম্মানিত পাঠকগণ। আপনারা প্রায়শ শুনে থাকেন 'ব্রিটিশ' শব্দের উচ্চারণ। যেমন একজন কোন একজনের ওপর মন্তব্য করলেন এভাবে, ওর কথা আর বলো না ভাই, সে কিন্তু একটা 'ব্রিটিশ'।

www.pathagar.com

মন্তব্য আরো শুনবেন, যেমন-আমি ভাই ঐ মহল্লার এক ব্রিটিশের পাল্লায় পড়েছিলাম। অন্যজন বলছেন, আপনি কি মন্টু মিয়ার কথা বলছেন? ঐ ব্যক্তি জবাবে বললেন, আপনি ঠিকই ধরেছেন।

এভাবে আমাদের সমাজে ব্রিটিশ, কিসিঞ্জার, বুশ ও মীরজাফর আর ঘসেটি বেগমদের নাম উচ্চারণ প্রায়ই শুনবেন, যেমন শুনছেন শয়তান, ইবলিস, খান্নাস উচ্চারণ।

খুব ভাল অর্থবোধক কয়েকটি শব্দ যেমন ব্যবহারকারীদের কর্ম ও চরিত্র দোষে খারাপ ও ভয়ঙ্কর শব্দে পরিণত হয়েছে, যেমন সাম্যবাদ, কমিউনিজম ইত্যাদি। অর্থ ভাল কিন্তু কর্ম খারাপ। এ জন্য এ সব শব্দ শুনলে লোকজন আঁৎকে ওঠে। অনুরূপভাবে 'ব্রিটিশ' তো খারাপ শব্দ নয়, কিন্তু তারা ১৯০ বছর আমাদের সাথে যে আচরণ করেছে, তাতে তারা তাদের জাত-পরিচিতিটাকে শাসিতদের কাছে পছন্দনীয় একটা শব্দ হিসাবে রেখে যেতে পারেনি।

'ব্রিটিশ' নাম কূটকৌশল ও ধূরন্ধরীর অপর নাম বলে যদিও আমরা মনে করি, কিন্তু আমাদের দেশে ব্রিটিশ কালচার, ব্রিটিশ পলিসি, ব্রিটিশ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থা, ব্রিটিশ আইন পূর্ণ শক্তিতে টিকে আছে। আছে ব্রিটিশ বশংবদরা পূর্ণ শক্তিতে।

কি অদ্ভূত চরিত্রের মানুষ আমরা! একদিকে ঘৃণা অন্যদিকে সমাদর, চরিত্রের এই কনট্রাস্ট কি দূর হবে না? মেকলে সাহেব তাই তো বলেছেন, আমরা এমন একটা শ্রেণী সৃষ্টি করে গেলাম যারা কোনদিনই আমাদের ভুলতে পারবে না, রঙে রক্তে আর চেহারায় ওরা ভারতীয় থাকলেও চিরকাল তারা থাকবে ব্রিটিশ অনুরাগী, ব্রিটিশের কৃষ্টির অনুরাগী।

www.pathagar.com

সংবর্ধনা মানে তেল ঢালা

তোষামোদ-সংস্কৃতি সমাজে যদি বিস্তার লাভ করে, তাহলে গঠনমূলক সমালোচনার পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। নিজের প্রশংসা অন্য লোকে করুক, তা প্রায় প্রত্যেকেই চায়। এই চাওয়ার মধ্যেও স্তর ভেদে, স্টেটাস ভেদে ও মানুষ ভেদে পার্থক্য আছে। কেউ কেউ তো চায় শুধু হাততালি, বিনিময়ে তার অবদান যাই হোক। ভাল চালচলন আর চরিত্র নিয়ে চলা, সকলের দোয়া চাওয়া খুবই ভাল ও নেক ইচ্ছা, কিন্তু জমার ঘরে শূন্য বা কিঞ্চিৎ জমা অথচ খরচের ঘরে ওভার ড্রাফট চলছে, তবুও তিনি চান হাততালি। মোসাহিবী, ভাঁড়ামী, জ্বী হুজুরী, চাটুকারী প্রভৃতি শব্দ তোষামোদেরই সমার্থবোধক শব্দ। ডাকাতি যে অর্থে 'সাহসিকতা' চুরি যে অর্থে 'কৌশল', ধনাঢ্য ব্যক্তি যে অর্থে 'বড়লোক', তোষামোদ সে অর্থেই একটি গুণ'। এ গুণ ইচ্ছা করলেই রপ্ত করা যায় না, চেষ্টা করেও সবাই আয়ত্ব করতে পারে না। যার প্রকৃতিতে তোষামোদী চেতনার ঢেউ খেলে, তিনি বিনা প্রশিক্ষণেই তোষামোদে পাকা উস্তাদ হয়ে উঠেন। জন্মসূত্রে প্রাপ্ত এ 'গুণ' বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে প্রকাশ পায়। যার চরিত্রে তোষামোদী প্রকৃতি নেই, তিনি বৈষয়িক স্বার্থ উদ্ধারে তোষামোদী করতে পারেন না।

www.pathagar.com

সংবর্ধনা কি? সংবর্ধনা এক প্রকার তোষামোদী বা চাটুকারিতা। যিনি সংবর্ধিত হবেন, তিনি সংবর্ধনা সভায় আসবেন। তাকে সকলে দেখবেন। তাকে উদ্দেশ্য করে প্রথমে কয়েকজন তৈলাক্ত শব্দ সংযোজন করে তেলাল বক্তৃতা দেবেন। বক্তৃতায় থাকবে যত সব তারিফ, হাছা-মিছায় ভর্তি। সংবর্ধিত ব্যক্তি মনে মনে খুব খুশি হবেন, তার চেহারায় আনন্দের ঢেউ খেলবে, কখনো তিনি মুচকি হাসবেন, তার বুকটা স্ফীত হবে, তার মনটা প্রফুল্লে ফুরফুরা হবে। সংবর্ধনা সভায় কেউ সংবর্ধিত ব্যক্তির সমালোচনা করেন না, এমন করার রেওয়াজও নেই। অতঃপর যাকে কেন্দ্র করে এ আয়োজন, তিনি বক্তৃতা দিতে দাঁড়াবেন। হাততালি পড়বে অজস্র। কয়েক মিনিট যাবে হাততালিতে। হাততালি থামলে তিনি বক্তৃতা শুরু করবেন। বক্তৃতা চলাকালে তিনি কয়েকবারই হাততালি পাবেন। এক সময় সাঙ্গ হবে সংবর্ধনা সভা। পত্রিকায় পর দিন সচিত্র খবর ছাপা হবে। বেহদ্দ ভাঁড়ামী আর ভাঁড় হওয়ার অনুষ্ঠানের নাম সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। আমার প্রশ্ন, সংবর্ধনা সভা কি চাটুকারিতা বা তোষামোদের সভা? ইসলামে কি এমন সভার সমর্থন আছে?

তোষামোদ-সংস্কৃতি সমাজে যদি বিস্তার লাভ করে, তাহলে গঠনমূলক সমালোচনার পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। নিজের প্রশংসা অন্য লোকে করুক, তা প্রায় প্রত্যেকেই চায়। এই চাওয়ার মধ্যেও স্তর ভেদে, স্টেটাস ভেদে ও মানুষ ভেদে পার্থক্য আছে। কেউ কেউ তো চায় শুধু হাততালি, বিনিময়ে তার অবদান যাই হোক। ভাল চালচলন আর চরিত্র নিয়ে চলা, সকলের দোয়া চাওয়া খুবই ভাল ও নেক ইচ্ছা, কিন্তু জমার ঘরে শূন্য বা কিঞ্চিৎ জমা অথচ খরচের ঘরে ওভার ড্রাফট চলছে, তবুও তিনি চান হাততালি।

মোসাহিবী, ভাঁড়ামী, জ্বী হুজুরী, চাটুকারী প্রভৃতি শব্দ তোষামোদেরই সমার্থবোধক শব্দ। ডাকাতি যে অর্থে 'সাহসিকতা' চুরি যে অর্থে 'কৌশল', ধনাঢ্য ব্যক্তি যে অর্থে 'বড়লোক', তোষামোদ সে অর্থেই একটি গুণ'। এ 'গুণ' ইচ্ছা করলেই রপ্ত করা যায় না, চেষ্টা করেও সবাই আয়ত্ব করতে পারে না। যার প্রকৃতিতে তোষামোদী চেতনার ঢেউ খেলে, তিনি বিনা প্রশিক্ষণেই তোষামোদে পাকা উস্তাদ হয়ে উঠেন। জন্মসূত্রে প্রাপ্ত এ 'গুণ' বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে

www.pathagar.com

প্রকাশ পায়। যার চরিত্রে তোষামোদী প্রকৃতি নেই, তিনি বৈষয়িক স্বার্থ উদ্ধারে তোষামোদী করতে পারবেনই না।

প্রত্যেক দেশে, প্রত্যেক যুগে, প্রত্যেক সমাজে এবং কর্মের প্রত্যেক অঙ্গনে এমনকি রাজনীতিতেও কুশলী তোষামোদকারীরা বিরাজ করছেন। তোষামোদে তুষ্ট থাকার নেতানেত্রীদেরও অভাব নেই। তোষামোদ নেনেওয়ালারাও তোষামোদ করনেওয়ালাদের সৃষ্টি করেন। পারস্পরিক স্বার্থ নিহিত। একদল তেল দেন আর একজন তেল নেন। এই তেলে তেলে তেলানিই হচ্ছে তোষামোদী। তোষামোদী করা বা নেয়া হচ্ছে উভয় পক্ষের লক্ষ্য অর্জনের পদ্ধতি বা মাধ্যম। হীনমন্যতা তথা Inferiority Complex-এর উদরে আবার কখনো Superiority Complex-এর উদরে তোষামোদ জন্ম নিয়ে লোভের কোলে হয় লালিত। তাই তোষামোদকারীর লোভাতুর রসনা নিত্যনতুন রস-আস্বাদনের জন্য থাকে ব্যাকুল। বিবেককে তারা মানে না, ব্যক্তিত্বকে নিয়ে তারা কেনাবেচা করে। এ কারণে তাদের সৃজনী প্রতিভার ওপর চাটুকারিতার পুরু পলেস্তার পড়ে। প্রজ্ঞার দ্বার অর্গলবদ্ধ করে কর্তার কীর্তনেই থাকে তারা সদা ব্যস্ত।

এডমান্ড বার্ক (১৭২৯-১৭৯৭) ছিলেন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের একজন শক্তিমান সদস্য। তিনি ছিলেন বক্তা, লেখক এবং রাজনীতিবিদ। বিলাতের অনেক গণআন্দোলনে তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। গণমানুষের সঙ্গে নিবিড় সংযোগ রক্ষা করে তিনি চলতেন। বিলাতের তৎকালীন সমাজে তোষামোদীর মত একটি ব্যাধি সংক্রমিত হয়ে সে সমাজকে কিভাবে আক্রান্ত করেছিল, সে অভিজ্ঞতা তিনি প্রচুর সঞ্চয় করেছিলেন। তোষামোদের ওপর তার পান্ডিত্যপূর্ণ মন্তব্য হচ্ছে এই, Flattery corrupts both the receiver and the giver.

আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতাও তাই। যিনি বা যারা তোষামোদ করেন এবং যিনি বা যারা তোষামোদ পেলে নিজেকে বা নিজেদের ধন্য মনে করেন, উভয়েই সমভাবে সমান অংশীদারিত্বে সমাজকে কলুষিত করেন।

www.pathagar.com

মৈথালী কবি বিদ্যাপতি বলেছেন,

'জাবে না মালতি কর পরগাস

তাবে ন তাহি মধুকর বিলাস'

অর্থাৎ যতদিন মালতি (পুষ্প) প্রকাশ (বিকশিত) হয় না, ততদিন তার উপরে ভ্রমর বিলাস করে না।

তোষামোদ লোভী ও তোষামোদকারীর অবস্থাও তাই। সেখানে যার কাছে রস ভান্ডার, সেখানেই মানববেশী ওই ভ্রমরাদের ভিড়। রাজা-বাদশাহদের থেকে শুরু করে অফিসের পিয়ন-দারোয়ান পর্যন্ত তোষামোদ রসে সিক্ত হওয়ার জন্য ব্যাকুল।

সেকালের রাজা বাদশাহ, আমীর ওমরাহদের দরবারে এমনকি খাস মহলেও ছিল ভাঁড় মোসাহেবদের অবাধ আনাগোনা। ভাঁড় মোসাহেবরা ছিল রাজা-বাদশাহদের দরবারের অলংকার, তারা ছিল রাজা-বাদশাদের দরবারের অত্যাবশ্যকীয় পারিষদ। ওদের ছাড়া রাজা-বাদশাহদের দরবার বসতো না, শাসকদের মেজাজ ঠিক থাকতো না, দরবারের শান-শওকত বজায় থাকতো না। শাসকরা চাইতেন সাক্ষাতে শতরূপে শতভাবে বিভিন্ন চটকদার শব্দ সংযোজন করে প্রশংসা করুক। আজকাল মোসেহেবীর টেকনিক পাল্টিয়েছে। কিন্তু তোষামোদের চরিত্র ঠিকই রয়েছে। বর্তমানে রাজনীতির অঙ্গনে তোষামোদের তেলদাতা ও গ্রহীতারা আধুনিক টেকনিকে তৈল নেয়া-দেয়ার ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন।

পাশ্চাত্যের একজন মনীষী G. Obrégon তোষামোদের ক্রেতা-বিক্রেতাদের উদ্দেশে বলেছেন, Don't be afraid of the enemies who attack you, but be afraid of the friends who flatter you. অর্থাৎ যে শত্রু তোমাকে আক্রমণ করে তাকে তুমি ভয় করো না, ভয় তোমাকে করতে হবে তাকে, যে তোমাকে তোষামোদ করে।

এর মানে সোজা, হামলাকারী শত্রুর হামলা মুকাবিলা করা যায়, তার পরিকল্পনা বুঝা যায়, জানা যায় কিন্তু তোষামোদকারীর হাতে কোন হাতিয়ার থাকে না, ঠোঁটে

www.pathagar.com

থাকে হাসি আর মুখের মিষ্টি কথা। এ নিয়ে সে বশ করে, স্বার্থ আদায় করে মিছরীর ছুরি দিয়ে।

আমাদের দেশের রাজনীতিতে তোষামোদী বাতাস খুব প্রবল বেগে চলছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে পেশ করছি। দূর অতীত থেকে নয়, নিকট অতীত থেকে উপহার দিচ্ছি।

জিয়াউর রহমান তখন শাসন ক্ষমতায়। তার মন্ত্রিসভার এক মন্ত্রী এক জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে জেনারেল জিয়াকে ইসলামের ইতিহাসের দ্বিতীয় খলিফার সাথে তুলনা করেন। জনসভায় গুঞ্জন শুরু হয়। বক্তার ভাগ্য ভাল, সেই জনসভায় জিয়াউর রহমান ছিলেন না। থাকলে কি মন্তব্য করতেন, তাও জানি না।

১৯৮৩ সালের ১০ নভেম্বরের ঘটনা। প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক লেঃ জেনারেল এইচএম এরশাদ শিশু একাডেমী প্রাঙ্গণে জাতীয় সমবায় মহাসম্মেলনে ভাষণ দিতে এসেছেন। এই সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন তৎকালীন পল্লী উন্নয়ন, সমবায় ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রী জনাব মাহবুবুর রহমান। অনুষ্ঠানে তিনি সভাপতির ভাষণে সমবায়ীদের উদ্দেশে বলেন, 'আমি আপনাদের একটি ফুল উপহার দিতে চাই। সে ফুলের নাম জেনারেল এরশাদ' (এরশাদ তখন মঞ্চে উপবিষ্ট)। এরশাদের কবিতাও তিনি পাঠ করেন।

১৯৯৯ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর জাতীয় সংসদে সংসদের উপনেতা এলজিআরডি মন্ত্রী জিল্লুর রহমান সংসদে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানাতে গিয়ে বলেন (শেখ হাসিনা সংসদে উপস্থিত ছিলেন), শেখ হাসিনার মর্যাদা আজ সক্রেটিস, আব্রাহাম লিংকন, মহাত্মা গান্ধী ও মাদার তেরেসার পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।

উদ্ধৃতি দিলে আরও উদ্ধৃতি দেয়া যায়। থাক এ পর্যন্তই। রাজনীতির অঙ্গনে সংবর্ধনার নামে তেলের লেনাদেনা যেভাবে শুরু হয়েছে, তাতে আমি ভয় পাচ্ছি। প্রথম ভয়টা হচ্ছে এই, সংবর্ধনার সরগরম বাজারে যেভাবে তেল ছিটাছিটি চলছে তাতে বাজার পিচ্ছিল হয়ে দুর্ঘটনা ঘটার আশংকা রয়েছে। দ্বিতীয় কথা হলো, সংবর্ধনার ব্যয়বহুল আয়োজন কি অপচয় খাতে শুমার হচ্ছে না? যদি আল্লাহ সে

www.pathagar.com

তালিকায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানকে গণ্য করেন, তাহলে তো তোষামোদকারী আর তোষামোদে তুষ্টরা শয়তানের ভাই হয়ে যাচ্ছে, সেদিকে কি খেয়াল আছে? তৃতীয়, সামনাসামনি নিজের প্রশংসা অন্যদের থেকে শোনার অসম্ভব চুলকানি বা এলার্জি থাকা কতটুকুই নৈতিকতা, সে প্রশ্ন কি করা যায় না?

সংবর্ধনার রাজনীতি প্রকারান্তরে তোষামোদের রাজনীতি, তেলের রাজনীতি, নৈতিকতা বিবর্জিত রাজনীতি বলে আমি মনে করি। পাঠকরা কি মনে করেন তা জানি না। সামনাসামনি কেউ কারো প্রশংসা করতে নেই, হাদীসে মানা আছে। আল্লাহর রসূল (সাঃ) উভয়কে তিরস্কার করেছেন। বিদেশী সম্মানিত মেহমানকে সংবর্ধনা দেয়া কোন পর্যায়ে পড়ে? উত্তর হচ্ছে এই, প্রথমত তা একটা আন্তর্জাতিক রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। গোটা ব্যাপার আন্তর্জাতিক প্রটোকলের অধীন। এটাকে পরিচিতি সভাও বলে। মেহমান মূল্যবান বক্তব্যও রাখেন।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বড় বড় ব্যক্তিত্ব বা মনীষীর সংবর্ধনা কি তোষামোদ বলা যায়? না তা মোটেই তোষামোদ বলা যায় না। তাদের সংবর্ধনা আমাদের প্রয়োজনে। পরিচিতি সভায় তাদের মূল্যবান ভাষণ শোনা, তারা আমাদের হাছা-মিছা প্রশংসার ঊর্ধ্বে উঠে গেছেন।

যত জ্বালা সবই দেশীয়দের নিয়ে। আমাদের দেশের যারা সংবর্ধনা আদায় করেন, সংবর্ধনা খরচাপাতি নেতারাই বহন করেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে। যারা সংবর্ধনার আয়োজন করেন, তারা এর থেকে কনট্রাক্টরী মুনাফাও পান।

দেশী নেতাদের সংবর্ধনার রমরমা বাজার অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর পরই বসেছিল। তারই এক চিত্র এঁকেছেন জনাব কেরামতউল্লাহ বিপ্লব দৈনিক মানবজমিনে। প্রকাশিত হয় ২৬/১১/০২ তারিখে। তা পাঠ করলে বুঝা যাবে, সংবর্ধনা কাকে বলে এবং তা কত প্রকার ও কি কি।

সংযোজন : কেরামতউল্লাহ বিপ্লব : মন্ত্রীদের সংবর্ধনা উৎসব চলছে এখনো। চারদলীয় সরকার গঠনের পর দেড় মাস পেরিয়ে গেলেও জেলা-উপজেলার রাজনৈতিক নেতা-কর্মীরা লাখ লাখ টাকা খরচ করে নিজ এলাকার মন্ত্রীদের অভিবাদন জানাতে ব্যস্ত। অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমান দেশের অর্থনৈতিক

www.pathagar.com

পরিস্থিতি নাজুক বলে মন্তব্য করার পরও লাগাতার সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের মহোৎসব থামেনি। সরকারের শীর্ষ পর্যায় থেকেও এ বিষয়ে নেয়া হয়নি কোন পদক্ষেপ। অনুসন্ধানে দেখা গেছে, ১০ই অক্টোবর নয়া সরকারের মন্ত্রীরা শপথ নেবার পর গত ৪৪ দিনে ২৮ মন্ত্রী, ২৮ প্রতিমন্ত্রী, ৪ উপমন্ত্রী ও ৯৮ এমপির জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে আয়োজন করা হয়েছে প্রায় ১২শ' সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। এ খাতে রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের খরচ কতো, তার সঠিক কোনো পরিসংখ্যান নেই। তবে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক দেশের শীর্ষ এক অর্থনীতিবিদ বলেছেন, এই টাকায় দরিদ্র ছিন্নমূল মানুষের জন্য ৬টি গুচ্ছগ্রাম নির্মাণ সম্ভব হতো। যাতে ৬শ'রও বেশি মানুষের আবাসন সমস্যা মিটতো। প্রাপ্ত তথ্যে জানা গেছে, মন্ত্রী হবার পর দলীয় নেতা-কর্মীদের কাছ থেকে সবচেয়ে বেশি সংবর্ধনা পেয়েছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী ড. খন্দকার মোশারফ হোসেন। কুমিল্লার দাউদকান্দি মেঘনায় ১২ই অক্টোবর থেকে ৭ই নভেম্বর পর্যন্ত স্বাস্থ্যমন্ত্রীর জন্য আয়োজন করা হয়েছে ২৮টি সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। একেকটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মঞ্চ, মাইক, পোস্টার, ব্যানার, ফেস্টুন, তোরণ, ফুলের মালা, উপহার সামগ্রী, খাবার বাবদ খরচ হয়েছে ২৫ থেকে ৬০ হাজার টাকা পর্যন্ত। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী আব্দুল্লাহ আল নোমান এর জন্য বৃহত্তর চট্টগ্রামে এ পর্যন্ত ২৩টি সংবর্ধনা অনুষ্ঠান করা হয়েছে। এর মধ্যে ৬টি অনুষ্ঠানের একেকটির ব্যয় ২ লাখ টাকা ছাড়িয়ে গেছে বলে স্থানীয় সূত্র জানিয়েছে। চট্টগ্রামের অপর পাঁচ মন্ত্রীকেও লালদীঘি ময়দানসহ বন্দরনগরীর বিভিন্ন স্থানে ৪৭টি সংবর্ধনা দেয়া হয়েছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী এম মোর্শেদ খান, বাণিজ্যমন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, পানিসম্পদ মন্ত্রী এলকে সিদ্দিকী, বেসামরিক বিমান ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মীর নাসির উদ্দিন, বন ও পরিবেশ প্রতিমন্ত্রী জাফরুল ইসলাম চৌধুরীর জন্য দেয়া চট্টগ্রামের ওই সংবর্ধনাগুলো ছিল সুবিশাল ও বর্ণাঢ্য। নির্বাচনের আগে বেগম খালেদা জিয়া কিংবা শেখ হাসিনার জন্য যেমন সমাবেশের আয়োজন করা হতো, ঠিক চট্টগ্রামের মন্ত্রীদের জন্য লালদীঘি ময়দানে সংবর্ধনার আয়োজনও ছিল তেমন সুবিশাল। নয়া মন্ত্রীদের জন্য তোরণ নির্মাণ করেই চট্টগ্রামের ৪টি ডেকোরেটর প্রতিষ্ঠান ২ লাখ ২৬ হাজার টাকার বিল তুলেছে। বন্দরনগরীর ২টি মাইক কোম্পানি নির্বাচনের পর মন্ত্রী-এমপিদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান বাবদ বিল নিয়েছে ১ লাখ ৬০ হাজার টাকার বেশি। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে এ হিসাব। তথ্যমন্ত্রী

www.pathagar.com

আব্দুল মঈন খান নরসিংদীর ঘোড়াশাল-পলাশে সংবর্ধনা পেয়েছেন ১৪টি। জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী একেএম মোশারফ হোসেন ময়মনসিংহ, ভালুকা ও ত্রিশালে ১৪ ও ১৫ই অক্টোবর ৭টি সংবর্ধনা উৎসবে যোগ দিয়েছেন। ১৫ই অক্টোবর টাঙ্গাইল কালিহাতির সন্তান বন ও পরিবেশমন্ত্রী শাজাহান সিরাজের সংবর্ধনাটি ছিল 'ঐতিহাসিক'। বন ও পরিবেশমন্ত্রী হবার পর শাজাহান সিরাজ সেদিন প্রথম যান টাঙ্গাইলে। কালিয়াকৈর থেকে কালিহাতী পর্যন্ত সেদিন মন্ত্রীকে অভিবাদন জানাতে তৈরি করা হয়েছিল ৩২টি সুদৃশ্য তোরণ। ৭৫ কিলোমিটার পথে সেদিন মন্ত্রীকে দেয়া হয়েছে ৯টি সংবর্ধনা। স্থানীয় সূত্রগুলো জানিয়েছে, বন ও পরিবেশ মন্ত্রীর এক দিনের সংবর্ধনার খরচ ৩ লাখ টাকার বেশি। এর বাইরে বন ও পরিবেশ অধিদফতর, বন শিল্প কর্পোরেশন, পরিবেশ অধিদফতরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঘটা করে মন্ত্রীকে অভিবাদন জানিয়েছেন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। কম যাননি বন ও পরিবেশ প্রতিমন্ত্রী জাফরুল ইসলাম চৌধুরী। নিজ জেলা ও উপজেলার রাজনৈতিক নেতাকর্মী ছাড়াও তিনি সংবর্ধনা নিয়েছেন চট্টগ্রাম বিভাগের ফরেস্ট বিটগুলোতে। মন্ত্রী হবার পর তিনি বিট অফিসগুলোতে গেছেন। প্রতিমন্ত্রীকে খাতির-যত্ন করতে রাজকীয় আয়োজন করেছেন স্থানীয় বন বিভাগের কর্মকর্তারা। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরীকে 'বর্ণাঢ্য' সংবর্ধনা দেয়া হয়েছে পটুয়াখালী ও মীর্জাগঞ্জে। স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবরের জন্য গণসংবর্ধনার আয়োজন হয় নেত্রকোনা ও মদনে। নারায়ণগঞ্জে গত এক মাস ধরে সংবর্ধনার হিড়িক ছিল বস্ত্রমন্ত্রী আব্দুল মতিন চৌধুরীর জন্য। শুধু ১৭ ও ১৮ই অক্টোবর তার জন্য জেলার বিভিন্ন স্থানে ১১টি বড় ধরনের সংবর্ধনা সভার আয়োজন হয়। এলজিআরডি প্রতিমন্ত্রী রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলুর জন্য নাটোরে ১২ই অক্টোবর থেকে ১২ই নভেম্বর পর্যন্ত এক মাসে ১৪টি সংবর্ধনার আয়োজন হয়। অধিকাংশ সংবর্ধনার আয়োজন করেন ইউপি চেয়ারম্যানরা। নৌ পরিবহনমন্ত্রী কর্নেল আকবরের জন্য কুমিল্লায় ১৮ ও ১৯ শে অক্টোবর সংবর্ধনা হয়েছে ৯টি। গত ১১ই নভেম্বর পর্যন্ত ঢাকা ও কুমিল্লার আরো ১৩টি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি ছিলেন প্রধান অতিথি। কুমিল্লা ও কোম্পানীগঞ্জে আইন ও সংসদ বিষয়কমন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদের বর্ণাঢ্য সংবর্ধনাঅনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় ২০ই অক্টোবর। নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ, মির্জানগরে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বরকত উল্লাহ বুলুর সম্মানে ১০ দিনে ১৩টি সংবর্ধনা

www.pathagar.com

অনুষ্ঠান হয়েছে। পাটমন্ত্রী হাফিজ উদ্দিন আহমদ বীর বিক্রমকে স্বাগত জানাতে স্থানীয় বিএনপি নেতারা ১৮ থেকে ২০ শে অক্টোবরের মধ্যে ভোলা, লালমোহন ও তজুমদ্দিনে ৬টি সংবর্ধনা সভা হয়। সংবর্ধনার জন্য ঢাকা থেকে পাটমন্ত্রী হেলিকপ্টারে ভোলা যান। কুষ্টিয়ার আলোচিত প্রতিমন্ত্রী আহসানুল হকের জন্য সংবর্ধনা অনুষ্ঠান হয় ৮টি। একটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মঞ্চ ভেঙ্গে পড়ে প্রতিমন্ত্রী আহতও হন। টাঙ্গাইল জেলা শহরে শিক্ষা উপমন্ত্রী আব্দুস সালাম পিন্টুর জন্য সংবর্ধনা সমাবেশ হয়েছে ৭টি। বস্ত্র প্রতিমন্ত্রীও লৌহজং-এর ৩টি সংবর্ধনা সভায় প্রধান অতিথি হন। দফতরবিহীন মন্ত্রী হারুন-উর- রশীদ খান মুন্নুর সংবর্ধনার জন্য ১৬ ও ১৭ই অক্টোবর মানিকগঞ্জের ৪টি অনুষ্ঠানে ৩ লাখ টাকার বেশি খরচ করা হয়েছে। নাগরিক কমিটির ব্যানারে সিরাজগঞ্জে বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকুকে ব্যয়বহুল সংবর্ধনা দেয়া হয়েছে ১৮ই অক্টোবর। ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী ফজলুর রহমান পটলকে সংবর্ধনা জানাতে লালপুর ও নাটোরে ১৭ ও ১৮ই অক্টোবর ১২টি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার বড় বোন খুরশীদ জাহান হক গত দেড় মাসে দিনাজপুরের ৩৪টি সংবর্ধনা সভায় প্রধান অতিথি হয়েছেন। ১৮ ও ১৯শে অক্টোবর দিনাজপুর, ফুলবাড়ি ও বিরামপুরে তিনি ৬টি সংবর্ধনা সভায় যোগ দেন। স্থানীয় সূত্রে পাওয়া তথ্যে জানা গেছে, একজন চোরাচালান গডফাদার মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রী খুরশীদ জাহান হককে সংবর্ধনা জানাতে দুটি সভায় এক লাখ টাকা চাঁদা দেন স্থানীয় বিএনপি নেতাদের। ১৫ থেকে ১৮ই অক্টোবর পর্যন্ত রংপুর ও লালমনিরহাটে ৭টি সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে যোগাযোগ উপমন্ত্রী আসাদুল হাবিব দুলুকে। খাদ্যমন্ত্রী তরিকুল ইসলামের জন্য ১৫ ও ১৬ই অক্টোবর যশোর শহরের মোড়ে মোড়ে ১২টি সংবর্ধনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিএনপি মহাসচিব ও এলজিআরডি মন্ত্রী আব্দুল মান্নান ভুঁইয়ার জন্য তার নির্বাচনী এলাকা নরসিংদীর শিবপুরে ২০শে অক্টোবর সাদামাটা সংবর্ধনা অনুষ্ঠান হয় ৪টি। এর বাইরে সংবর্ধনা তালিকার শীর্ষে আছেন ঢাকার মন্ত্রী মির্জা আব্বাস ও সাদেক হোসেন খোকা। গত দেড় মাসে তাদের এক একজনের জন্য রাজধানীর বিভিন্ন পাড়া, মহল্লা, প্রতিষ্ঠান, সংস্থার অফিসে ৬০টির বেশি সংবর্ধনা সভা হয়েছে। ২২শে অক্টোবর জাসাস ৮ মন্ত্রীকে সংবর্ধনা দিয়েছে ঢাকায়। সংবর্ধনা নেবার তালিকায় যে সব এমপি এগিয়ে রয়েছেন তারা হলেন মেজর (অবঃ) কামরুল

www.pathagar.com

ইসলাম, এডভোকেট খন্দকার মাহবুব হোসেন, নাসির উদ্দিন পিন্টু, মেজর (অবঃ) মান্নান, সালাহউদ্দিন আহমদ, ভিপি জয়নাল ও জহির উদ্দিন স্বপন। ঢাকা ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউট ও পাবনার সাঁথিয়ায় ৪টি সংবর্ধনায় প্রধান অতিথি হয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর আমীর ও কৃষিমন্ত্রী মতিউর রহমান নিজামী। ফরিদপুর ও ঢাকায় জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল আলী আহসান মুহম্মদ মুজাহিদের জন্য ৩টি বড় ধরনের সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। জামায়াত নেতাদের সংবর্ধনায় লক্ষণীয় ছিল বাহুল্য খরচ বর্জনের বিষয়টি। অনুসন্ধানে জানা গেছে, অধিকাংশ সংবর্ধনার জন্য মন্ত্রী-এমপিরা বিশেষ আর্থিক বরাদ্দ দিয়েছেন সংশ্লিষ্ট এলাকার দলীয় নেতাদের। মন্ত্রীদের সংবর্ধনার জন্য জেলা-উপজেলায় চাঁদা তোলার অভিযোগও এসেছে বিভিন্ন এলাকা থেকে। এ মাসের প্রথম দিকে রাজকীয় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে পত্রিকার পাতায় শিরোনাম হয়েছেন স্পিকার জমির উদ্দিন সরকার। ২৮শে অক্টোবর স্পিকার হবার পর তিনি তার গ্রামের বাড়ি পঞ্চগড়ে যাবার দিন রংপুর থেকে পথে পথে তাকে স্বাগত জানাতে প্রায় ৩০০ তোরণ নির্মাণ করা হয়। একইভাবে বর্ণাঢ্য সংবর্ধনা হয়েছে ডেপুটি স্পিকার আখতার হামিদ সিদ্দিকীর জন্য তার জেলা মাগুরায়।

সাধে কি আমি বলেছি, সংবর্ধনা মানে তেল ঢালা। এসব সংবর্ধনা তো জেহাদের ময়দানে পা রাখার আগেই গাজী হওয়ার নামান্তর।

www.pathagar.com

মুদ্রাদোষ

মুদ্রাদোষ থেকে আমাদের জন্য অনেক কিছু শিক্ষণীয় রয়েছে। ওর এ দোষ আছে, আমার এ দোষ নেই, তার এ দোষ দেখে আমি আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করে শোকরগোজার বান্দাহ হিসাবে নিজেকে উপস্থাপন করতে পারি। আমার এ দোষ নেই, এ জন্য শুকরিয়া আদায়ের সাথে সাথে অপরের প্রতি অর্থাৎ যাদের মুদ্রাদোষ রয়েছে, তাদের প্রতি সংবেদনশীল হতে পারি, তাদের জন্য দোয়া করতে পারি, এ অভ্যাস বা দোষ ত্যাগের মত হলে তা ত্যাগের জন্য ওদের সহায়তা করতে পারি। আল্লাহ এই ব্যাধি যেকোন জনকে দিতে পারেন, এ কথা স্মরণ করে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতি অন্তরে ভয় বাড়াতে পারি। মুদ্রাদোষ যত আদ্‌না দোষই হোক না কেন, তা একটা দোষ তো বটেই, সুতরাং যাদের এ দোষ আছে, সমাজে একটুখানি হলেও তারা দুর্বল থাকে। এই দুর্বলতার সুযোগ কারো নেয়া উচিত নয়, যাদের মুদ্রাদোষ নেই। কোন অসুস্থ লোককে দেখে উপহাস করতে নেই। আজ আমার দেহে এ অসুখ নেই, কাল যে তা হবে না, এ গ্যারান্টি কি কোন মানুষ দিতে পারে? মুদ্রাদোষের ব্যাপারেও একই কথা খাটে। আজ এ দেহে, কাল ঐ দেহে। পর দিন হয়তো আমার মধ্যেও এ অভ্যাস পয়দা হতে পারে।

www.pathagar.com

'মুদ্রাদোষ' মানে মুদ্রার কোন দোষ নয়। মুদ্রায় যদি কোন দোষ থাকেও, সেটা বুঝবেন মুদ্রা বিশেষজ্ঞরা এবং অর্থ মন্ত্রণালয়। আমি এখানে মুদ্রার দোষ নিয়ে কোন কথা বলছি না, বলার ক্ষমতাও আমার নেই, সেই জ্ঞানও নেই। মুদ্রা মানে পাঁচ টাকার মুদ্রা, এক টাকার মুদ্রা, আধুলি, সিকি, দশ পয়সা, পাঁচ পয়সা এবং এক পয়সা। এক পয়সা, পাঁচ পয়সা ও দশ পয়সার মুদ্রা আজকাল নজরেও পড়ে না। কেনা-বেচায় এসব মুদ্রা ব্যবহার হয় না। কারণ, মূল্যহীন হয়ে পড়েছে এসব মুদ্রা। সিকি আধুলিও বিদায়ের পথে। কারণ, তাদের কোন ক্রয় ক্ষমতা নেই। কোনভাবে এক টাকার ধাতব মুদ্রা এখনও টিকে আছে, তাও ক'দিন টেকে বলা যায় না। কাগজের এক টাকার নোট তো আজকাল নজরেই পড়ে না। সুতরাং মুদ্রারাই যখন একে একে বিদায় হয়ে গেছে এবং বিদায় হচ্ছে, তখন মুদ্রার দোষগুণ তালাশ করে কোন ফায়দা নেই।

আমাদের দেশ থেকে ধাতব মুদ্রা হারিয়ে গেলেও 'মুদ্রা' শব্দটি অভিধানে সগৌরবে টিকে আছে এবং টিকে থাকবেও। 'মুদ্রা' শব্দের ডান পাশে যদি 'চিহ্ন' শব্দ বসে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে, মধ্যে কোন ফাঁক না থাকে, তাহলে মুদ্রা শব্দটির একাকীত্ব থাকে না, নিঃসঙ্গতা দূর হয়ে যায়, দুয়ে মিলে হয়ে যায় অর্থবহ একটি শব্দ 'মুদ্রাচিহ্ন'। এভাবে একই নিয়মে যদি 'কর' এসে গা ঘেঁষে দাঁড়ায়, তাহলে হয়ে যায় 'মুদ্রাকর', মুদ্রা এখানেও একটা স্টেটাস পেয়ে যাচ্ছে। 'ক্ষর'যুক্ত হলে মুদ্রা হয়ে যাচ্ছে 'মুদ্রাক্ষর' এবং 'ঙ্কন' যুক্ত হলে মুদ্রা হয়ে যায় 'মুদ্রাঙ্কন', বিজ্ঞান যোগ হলে হয়ে যায় মুদ্রাবিজ্ঞান, 'যন্ত্র' শব্দটি যোগ হলে হয়ে যাচ্ছে 'মুদ্রাযন্ত্র', আর 'স্ফীতি' যোগ হলে মুদ্রা হয় মুদ্রাস্ফীতি, সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক জীবনে দুশ্চিন্তা ডেকে আনে, অভাব বৃদ্ধি করে। সবই নানা দৃষ্টিকোণ থেকে সমন্বয় করা যায়, সহ্য করা যায়, মেনেও নেয়া যায়, মুদ্রার সমন্বয়ী স্টেটাসকে স্বীকারও করা যায়, কিন্তু মুদ্রার পাশে যখন 'দোষ' নামক শব্দটি এসে দাঁড়ায় আর তা যখন কারও ওপর ভর করে, তখন বিচিত্র দৃশ্য সৃষ্টি হয়, কেউ কেউ এসব দৃশ্য দেখে হাসেন, কেউ কেউ বিরক্তি বোধ করেন, কেউ কেউ আনন্দ উপভোগ করেন।

মুদ্রাদোষকে ইংরেজিতে বলে Mannerism বা Ludicrous. মুদ্রাদোষ কি কোন অসুখের নাম? এ নিয়ে বড় বড় চিকিৎসকের মধ্যে বিতর্ক আছে। কেউ

www.pathagar.com

কেউ বলেন অসুখ, আবার কেউ কেউ মুদ্রাদোষকে অসুখ বলেন না। তবে উভয়পক্ষই একটি ক্ষেত্রে অভিন্ন মত পোষণ করেন, কোন কোন মুদ্রাদোষ বিশেষ বিশেষ অসুখের বাই-প্রোডাক্ট। তবে অভ্যাস দোষ বলেও অনেকে মত পোষণ করেন। কোন কোন মুদ্রাদোষ থেকে খুব সতর্ক থাকলে একে পরিত্যাগও করা যায়, এমন দৃষ্টান্তও রয়েছে।

মুদ্রাদোষ কত প্রকার ও কি কি? এ প্রশ্নের উত্তর দেয়া আমার পক্ষে তো সম্ভব নয়ই, যারা এ বিষয়ে গবেষণা করে অনেক লেখালেখি করেছেন, তাদের লেখায়ও এ প্রশ্নের উত্তর পাইনি। নানা প্রকার এবং অনেক ধরনের মুদ্রাদোষ আছে। চূড়ান্ত হিসাব কষা মুশকিল।

তবে অসুখ-বিসুখ থেকেও অনেকের মুদ্রাদোষ জন্ম নেয়, এ কথা আগেই বলেছি। অভ্যাসগত মুদ্রাদোষই বেশি, যাকে বলা যায় ব্যক্তিগত মুদ্রাদোষ। দেখাদেখি মুদ্রাদোষও আছে অনেকের মধ্যে। গণমুদ্রাদোষও আছে গণহারে।

কোন কোন ব্যক্তির অসুখের আগে কোন মুদ্রাদোষ ছিল না, অসুখ থেকে নিরাময়ের পর দেখা গেল মুদ্রাদোষ, এমন তিন ব্যক্তিকে আমি চিনি ও জানি। একজন তো কারো সঙ্গে কথা বলার সময় অথবা একাকী থাকলেও কিছুক্ষণ পর পর ডান হাতের অগ্রভাগের উল্টা পিঠ নাকের কাছে নিয়ে কয়েকবার ডান-বাম করেন, এটা তার অভ্যাসে বা মুদ্রাদোষে পরিণত হয়েছে। অথচ এই ব্যক্তিকে যখন কোন সভায় বা অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করতে দেখি, তখন তিনি হয়তো খুব সচেতন ও সতর্ক থাকেন, সে সময় নিজ নাকের কাছে হাত নিয়ে ডান-বাম করতে দেখা যায় না। এতে মনে হয়, তিনি আরও সচেতন ও সতর্ক থাকলে এই মুদ্রাদোষ দূর করতে পারবেন।

আর এক ভদ্রলোককে জানি, যিনি কয়েক বছর আমার সহকর্মীও ছিলেন। একবার তিনি টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হন। প্রায় এক মাস রোগ ভোগের পর কাজে যোগদান করেন। লক্ষ্য করা গেল, তিনি অদ্ভূত এক মুদ্রাদোষে আক্রান্ত। মুদ্রাদোষটি হচ্ছে এই, ১৫/২০ কদম হাঁটার পর একবার থামবেন এবং থেমে পিছন দিকে তাকাবেন, আবার পথ চলবেন। হাঁটতে গেলেই কয়েক কদম আগে বেড়ে একবার পিছনে তাকাবেনই। বাসে, ট্রেনে চলার সময়ও মুদ্রাদোষের একই

www.pathagar.com

অভ্যাস অনুশীলন করতে তাকে দেখেছি। জিজ্ঞাসা করলে শুধু হাসতেন, কোন উত্তর দিতেন না। খুব পীড়াপীড়ি করলে বলতেন, এমন যে আমি করি তা বেশ বুঝি, কিন্তু কেন যে করি তা আমি নিজেই বুঝি না।

অন্য একজনকে জানি। তিনি কয়েক বছর আগে ইন্তেকাল করেছেন। তিনি কারো সঙ্গে কথা বলার সময় অথবা একাকী থাকলেও কিছুক্ষণ পর পর ঘাড়ের আড়মোড়া ভাঙতেন। মাথা ডানে-বামে দিয়ে গর্দানের জড়তা দূর করতেন। এ অভ্যাস বা মুদ্রাদোষ তার সৃষ্টি হয়েছিল কঠিন এক রোগে ভোগার পর। খুব সতর্ক থেকেও তিনি এ অভ্যাস দূর করতে পারেননি। তিনি রসিক লোক ছিলেন। বলতেন, আমি শয়তান তাড়াই গর্দান থেকে।

অভ্যাসগত ব্যক্তিগত মুদ্রাদোষ :

এমন মুদ্রাদোষ নানা প্রকার, নানা জাতের, অসংখ্য, বেশুমার। মুদ্রাদোষ হলো শরীরের কোন এক অঙ্গের বা একাধিক অঙ্গের যুক্ত বিশেষ ভঙ্গি যা বার বার প্রদর্শন করা হয় অথবা কথা বলার সময় কোন খণ্ড কথা বা পূর্ণ কথা বার বার উচ্চারণ করাও মুদ্রাদোষ।

অঙ্গভঙ্গীর মুদ্রাদোষগুলোর মধ্যে হচ্ছে, মাথার চুলে অঙুলী চালনা করা, মাথার পিছনে হাত দেয়া, কপালের দুই প্রান্তে এক হাতের দু'আঙুল সম্প্রসারণ করে তা দিয়ে মৃদুচাপ দেয়া এবং ধীরে ধীরে আঙুলদ্বয় কপালের মধ্যভাগ পর্যন্ত এনে যুক্ত করা, নিজের ভ্রূ বার বার পরিপাটি করা, নাকের অগ্রভাগ আঙুল দিয়ে মোছা। গোঁফওয়ালাদের কেউ বার বার গোঁফে হাত দেন, অনেক দাড়িওয়ালা নিজেদের দাড়িতে হাত দেন বা মৃদু টানেন, কেউ কেউ হাতের আঙুল নাচান। হাতের কলম দিয়ে ঠোঁট বা দাঁতে বার বার স্পর্শ করেন, পা নাচাবেন, কথা বলার সময় অন্যের কাঁধে বা দেহে ধাক্কা দিয়ে কথা বলবেন, এসব হচ্ছে ব্যক্তিগত মুদ্রাদোষ। আরও অনেক আছে, কতইবা বলা যায়।

দু'জনে কথা বলছেন। উভয়ের আসনের মধ্যে ফারাক মাত্র দু'তিন হাত বা বড়জোর চার হাত। সাধারণ মেজাজে ঠাণ্ডা মাথায় স্বাভাবিক ও সাধারণ বিষয়ে তারা

www.pathagar.com

কথাবার্তা বলছেন; কিন্তু লক্ষ্য করে দেখবেন তারা দু'তিন হাত দূরত্বে বসে কত Decibel মাত্রায় (শব্দের তীব্রতার মান) কথা বলছেন। একশ' হাত দূরের মানুষ পর্যন্ত তাদের কথাবার্তা শুনতে পারছে এবং বুঝতে পারছে। আস্তে আস্তে তারা কথা বলেন না। অনেকেই আস্তে কথা বলতে পারেন না। শব্দ পীড়ন ছাড়া অনেকেরই কথা বলার অভ্যাসও নেই। অকারণে এবং অযৌক্তিকভাবে কণ্ঠস্বরের ভলিউম বাড়িয়ে অনেকে কথা বলেন। এটাকে কি কথা বলার মুদ্রাদোষ বলবেন? কেউ কেউ তো তা বলে থাকেন। রেডিও এবং ক্যাসেট চূড়ান্ত ভলিউমে না তুলে অনেকে এসব ব্যবহার করতে পারেন না। এটাও তাদের এক ধরনের মুদ্রাদোষ। টেলিফোন ব্যবহারেও অনেকের মুদ্রাদোষ আছে। কেউ কেউ অন্যের মাগ্না টেলিফোন ব্যবহারের সুযোগ পেলে কমপক্ষে ৫/৭ জায়গায় টেলিফোন করবেনই। এদিকে টেলিফোনের মালিক বিরক্ত হচ্ছেন, ভিতরে ভিতরে ক্ষুব্ধ হচ্ছেন, সেদিকে কোন খেয়ালই নেই। আমি মনে করি, এও এক ধরনের কমনসেন্সের মুদ্রাদোষ। এক বা দু'ঘণ্টা সময় পার না করে টেলিফোন ছাড়বেন না। তাদের কথা হলো, অল্প আলাপে কি পেট ভরে? নানা প্যাঁচাল আর প্যাঁচাল। তাদের এক ঘণ্টার আলাপের সার কথা হয়তো মাত্র কয়েকটি বাক্য। বাদবাকি ফালতু কথা বা আবর্জনা ছাড়া আর কিছু নয়। এ অভ্যাসও এক প্রকার মুদ্রাদোষ।

কলেজ জীবনের আমার শ্রদ্ধেয় তিনজন অধ্যাপকের তিনটি মুদ্রাদোষের কথা মনে পড়ে। বাংলার অধ্যাপক তার লেকচারে কয়েক বাক্য পর পরই বলতেন 'ধর মনে কর'। প্রথম দিকে এ নিয়ে ছাত্রদের মধ্যে বেশ হাসি-তামাশা হতো, প্রায় মাস দুয়েক পর ব্যাপারটি গা-সওয়া হয়ে যায়। একদিন তো একটা মজার ঘটনা ঘটে। কলেজ জীবনের শুরুর দিনগুলোর কোন একদিনের ঘটনা। স্যার পড়াচ্ছেন আর ব্যাখ্যা দিচ্ছেন, 'ধর মনে কর' এই মুদ্রাদোষ বার বার আসছে। পিছনের বেঞ্চ থেকে এক ছাত্র মাথা নিচু করে 'ধর মনে কর' শোনার সাথে সাথে বললো, 'হ্যাঁ ধরলাম, মনে করলাম'। স্যার ছাত্রটিকে চিনতে পারলেন না, অন্য কেউ তার নামও স্যারকে বলেও দিল না। স্যার খুব রাগ করেছিলেন সেদিন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান যে স্যার পড়াতেন, তার মুদ্রাদোষ ছিল এই, বক্তৃতার ৫/৭ বাক্য বলার পর বলতেন you see. এটা তিনি কারণে-অকারণে বলতেনই। ইংরেজির

www.pathagar.com

এক স্যার প্রায়ই বলতেন I mean. তিনজন স্যারই ছিলেন শিক্ষক হিসাবে আদর্শ ও মানুষ হিসাবে খুবই ভাল। এ জন্য তাদের মুদ্রাদোষ ছাত্রদের মাঝে খুব একটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতো না। তাদের সুন্দর ব্যক্তিত্ব এবং শিক্ষকতার সাফল্য মুদ্রাদোষকে ঢেকে ফেলে।

শতাধিক প্রকার মুদ্রাদোষের খবর আপনি আমি প্রত্যেকেই জানি। তাদের অনেকের সঙ্গে প্রতিদিন অনেকেরই কথা হয়। প্রচণ্ড মুদ্রাদোষে আক্রান্ত কোনো একজনের সঙ্গে আমার প্রায়ই দেখা হয়। তার মুদ্রাদোষ হলো, কয়েক কথা বলার পরই বলেন, 'আমি কি বলছি বুঝতে পারছেন?' আমি কত দিন তাকে বলছি, বাংলা ভাষাই তো বলছেন, না বুঝার তো কোন কারণ নেই, আপনি বলে যান। এর পরও কিন্তু তার এই পুনরাবৃত্তি বন্ধ হয়নি। তার সারিন্দা তিনি বাজাতেই থাকেন। অন্য একজন আছেন, তিনি কথার ফাঁকে ফাঁকে 'আল্লাহ ভরসা, চিন্তা করবেন না' বলবেনই, উত্তেজিত হলে বার বার 'ঘোড়ার ডিম' তার মুখ দিয়ে বের হয়।

অনেকের অনেক রকমের মুদ্রাদোষ আছে, কোন কোন জনের মুদ্রাদোষ শ্রোতার বিরক্তি উৎপাদন করে না। কোন কোন জনের মুদ্রাদোষ শ্রোতার জন্য খুবই বিরক্তিকর। আবার কোন কোন জনের মুদ্রাদোষ শ্রোতাকে হাসায়, আনন্দ দান করে।

মনে করুন, ধরে নিন, বাই দি বাই, ইন ফেক্ট, ব্যাপার হলো, ধরেন গিয়া, বুঝলেন না, কথা অইলো গিয়া, ওয়েট এ বিট, এক্সকিউজ মি, চৌদ্দবার একশ'বার ইত্যাদি ইংরেজি, বাংলা, উর্দু, হিন্দি শব্দের মুদ্রাদোষ রয়েছে অনেকের। বিশেষ কোন গালি এবং বিশেষ অশ্লীল বাক্যও কারো কারো অভ্যাসকে এমনভাবে বশীভূত করেছে, যা মুদ্রাদোষে পরিণত হয়েছে, ছোটদের ধমক দিয়ে অনেকে বলেন 'গাধা' 'তোমার মাথা' ইত্যাদি। টেবিলে থাপ্পড় না দিয়ে বা অন্যের গায়ে ধাক্কা না দিয়ে, লম্বা ভূমিকা না দিয়ে জরুরি কথাটা সরাসরি উপস্থাপন করা অনেকের পক্ষে সম্ভব হয় না। মুদ্রাদোষ বিচিত্র। মুদ্রাদোষ আছে অনেক লেখকের ও বক্তার, হরেক জনের মধ্যে না হলেও অনেকের মধ্যে তো আছেই।

www.pathagar.com

অনেকের আবার মুদ্রাদোষ হলো বাংলা ভাষায় আলাপ করার সময় ইংরেজি শব্দ পূরণ করে নিজেদের বক্তব্য পেশ করার। এটাকে তারা আধুনিক আভিজাত্য মনে করেন। But, So, However, Sorry, Oh! Yes ইত্যাদি শব্দ তো তারা আলাপে অহরহ যোগ করেন, এরই সাথে অনেক বিদেশী শব্দ ফাঁকে ফাঁকে যোগ না করলে বক্তব্যই যেন যুৎসই হয় না। এমন একজনকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনি কি অন্যান্য ভাষার সাহায্য ছাড়া মনের ভাব প্রকাশ করতে পারেন না? উত্তরে তিনি বলেছিলেন, হ্যাঁ পারি। আমি বললাম, আপনি যে এতক্ষণ কথা বললেন, এমন আলামত তো দেখলাম না।

তাকে এক গল্প শুনালাম। এক উচ্চশিক্ষিত বাঙালি যুবক চাকরির ইন্টারভিউ দিচ্ছেন। যুবক বাংলা ভাষায় সব প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। যে শব্দটি ইংরেজিতে বলতে হয়, তাও তিনি বাংলায় বলছেন। ইন্টারভিউ বোর্ডের এক সদস্য যুবককে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি ইংরেজি বলেনই না? যুবক বললেন, অবশ্যই ইংরেজিতে কথা বলি তার সঙ্গে, যার ভাষা ইংরেজি অথবা তার সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলি যার সঙ্গে আমার কথা বলার একমাত্র মাধ্যম ইংরেজি ভাষা। আমি বাংলা জানি, ইংরেজি ভাষাও জানি, তাই মিশাল ভাষা ব্যবহার করতে হয় না।

এ গল্প সেই যুবককে শোনানোর পরও মিশাল মুদ্রাদোষ তার যায়নি। অথচ সেই ভদ্রলোককে যদি তার বক্তব্য ইংরেজি ভাষায় বলতে হতো, তাহলে তিনটি বাক্যও ইংরেজিতে বলার ক্ষমতা তার নেই, তা আমি নিশ্চিত বলতে পারি।

দেখাদেখি মুদ্রাদোষ :

দেখাদেখি মুদ্রাদোষ-আক্রান্তও অনেকে। ডোন্ট মাইন্ড প্লিজ—এ বাক্যটির দেদার প্রয়োগ চলছে। যদিও ভুল প্রয়োগ। মাইন্ড শব্দটি ক্রিয়াপদ কখনো নয়, বিশেষ্য মাত্র, মাইন্ড শব্দটি যদি ক্রিয়াপদই না হলো, তাহলে এর অর্থ 'মনে করা' কেমন করে হয়? হয় না, তবুও এর প্রয়োগ চলছে যদিও অপপ্রয়োগ। No Problem আর একটি শব্দের প্রয়োগ প্রায়ই শোনা যায়, কারণে-অকারণে No

www.pathagar.com

Problem-যেন বাত কা বাত হয়ে গেছে। কথায় কথায় কসম করা আর এক মারাত্মক মুদ্রাদোষ ব্যাধি। এ ব্যাধিতে অনেকেই আক্রান্ত। বাপের কসম, মায়ের কসম, মাটির কসম, মাথার কসম, শুকনা কাঠের কসম, বিদ্যার কসম অনেকেই করেন। প্রকৃতপক্ষে এসব কসম অর্থহীন। কথায় কথায় কসম করার কোন মানে নেই, যুক্তি নেই এবং তা শরীয়ত সমর্থিতও নয়। কেউ কেউ বলেন, এ একটা বদঅভ্যাস, অজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ, নিজেদের বক্তব্যের ভিত্তির দুর্বলতা, কিন্তু কেউ কেউ বলেন এও এক প্রকার মুদ্রাদোষ।

মহামারীর মত গণমুদ্রাদোষেও অনেকে আক্রান্ত। এ পর্যায়ে পড়ে দু'টি শব্দের একটি খণ্ডিত বাক্য 'ঠিক আছে?' দু'তিন কথার পরই গানের ধূয়া টানার মত বার বার বক্তা বলেন 'ঠিক আছে?' এ হচ্ছে গণবদঅভ্যাসের মুদ্রাদোষ। এ মুদ্রাদোষে যারা আক্রান্ত তাদের একজনের বক্তব্য শুনুন। বন্ধুকে বলছেন, 'আগামীকাল সকাল আটটার সময় বাসায় থাকবেন, আমি আপনার বাসায় আসবো, ঠিক আছে? আমরা দু'জন গাজীপুরে যাব, ঠিক আছে? পরের প্রোগ্রাম ঠিক করবো গাজীপুর থেকে ফেরার পর, ঠিক আছে?

এই ক'টি বাক্যের মধ্যে তিনবার এসেছে 'ঠিক আছে' বাক্যটি।

যদি শ্রোতা বন্ধুটি বলেন, তোমার কথা তুমি বলে যাও, ঠিক আছে কি ঠিক নেই, তা পরে চিন্তা করে দেখবো, তাহলে বন্ধুটিকে লজ্জা দেয়া হয়।

যদি শ্রোতা বন্ধু বলেন, তোমার কোন কথাই ঠিক নেই, কারণ আমার অন্য প্রোগ্রাম আছে, আমি গাজীপুর যেতে পারবো না। তাহলে বন্ধুটির সব বক্তব্যই মাঠে মারা যায়।

যদি শ্রোতা বন্ধু প্রথমেই শর্তারোপ করে বলেন, ভাই, তুমি যা বলতে চাও বল, কিন্তু 'ঠিক আছে' এই দুই শব্দের বাক্য একবারও উচ্চারণ করতে পারবে না, তাহলে দেখা যাবে এই মুদ্রাদোষে ভীষণভাবে আক্রান্ত লোক তার বক্তব্যই পেশ করতে পারবেন না, খুব সতর্ক হয়ে কথা বললেও বার বার হোঁচট খাবেন।

www.pathagar.com

এই 'ঠিক আছে' মুদ্রাদোষে আক্রান্ত তরুণ ও যুবকদের অধিকাংশ। একবার তো দু'মাস্তানের মধ্যে এ নিয়ে তুমুল বিতর্ক শুরু হয়। বিতর্ক মারামারি পর্যন্ত গড়াবার উপক্রম হয়েছিল। বিতর্ক শুরু হয় এভাবে :

- ধর তোমার কাছে এক হাজার টাকা আমি পাই, ঠিক আছে?

- না ঠিক নয়, তুমি আমার কাছে এক টাকাও পাও না।

এই 'ঠিক আছে' নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। পরে উত্তপ্ত বিতর্ক, উত্তেজনা, হাতাহাতির পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে। তাই কারো কারো মুদ্রাদোষ অন্যের জন্য মহা জ্বালাতন। কোন কোন অধীনস্থ ব্যক্তি তার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলার সময় প্রতি কথায় দু'তিন বার 'স্যার' যোগ না করলে কথা বলতে পারেন না। সমাজে অসংখ্য তরুণ ও যুবক আছেন তারাও 'ঠিক আছে', মুদ্রাদোষ-নির্ভর না হয়ে কথা বলতে পারে না। অভ্যাসের সঙ্গে মুদ্রাদোষের কোন সম্পর্ক আছে কিনা তা ভেবে দেখার দাবি রাখে। আমার ধারণা, অভ্যাসের বিশেষ একটা অ্যাকশন বা হরকত মুদ্রাদোষ। সকল মুদ্রাদোষ অভ্যাস থেকেই জন্ম নিয়েছে। কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ, আবার কোন কোনটা অন্যের জন্য মারাত্মকভাবে পীড়াদায়কও বটে। যেমন এই 'ঠিক আছে' বাক্যটি।

দেখ্‌দেখা অনুকরণের মুদ্রাদোষ, যেমন কেউ কেউ নজরুল ভক্ত হওয়ার প্রমাণ করার জন্য মাথায় বাবরি চুল রাখেন। রোনাল্ড ভক্ত হওয়ার জন্য মাথার চুল কামিয়ে আগ মাথায় অর্থাৎ কপালের ওপরে কিছু চুল রাখেন। বিশেষ কারো কারো অনুকরণে হাঁটা, হাসা, কথা বলা, পোশাক বানানো, পোশাক পরা, এসবকে আনুকরণ যেমন বলা যায়, অনুকরণের অভ্যাসও বলা যায়, আবার মুদ্রাদোষও বলা যায়।

মুদ্রাদোষ ভাল না মন্দ অর্থাৎ মুদ্রাদোষ থাকা উচিত কিনা, এ ব্যাপারে নানা কথা বলা যেতে পারে। কিন্তু এ ব্যাপারে একটা কথা অবশ্যই মানতে হবে, যাদের মুদ্রাদোষ জন্মগত, দেহের রক্ত প্রবাহে বা গঠনের মধ্যে কোন না কোন অস্বাভাবিকতা নিয়ে জন্ম হয়েছে, তাদের মুদ্রাদোষ দূর হয় না। জন্মগত বাঁকাকে সোজা করা যায় না, সোজাকেও বাঁকা করা যায় না। যা আছে তা থাকবেই। যা জন্মগত নয়, জন্মের পর পরিবেশ থেকে অর্জন করতে হয়, তা অনেকে

www.pathagar.com

অনেকভাবে গ্রহণ করেন। অনুকরণের প্রবণতা যাদের মধ্যে প্রবল এবং যে কোন মুহূর্তে এ প্রবণতা বিশেষ দিকে ঝুঁকে পড়ে গ্রহণ করে নেয়, প্রায় ক্ষেত্রে সেটাই তাদের মুদ্রাদোষ হয়ে যায়। আগেই বলেছি, অসুখ-বিসুখ থেকে যাদের মধ্যে মুদ্রাদোষ জন্ম নেয়, তা ত্যাগ করা কঠিন। তবে শখ করে যারা নিজেদের মধ্যে মুদ্রাদোষ-অভ্যাস গঠন করেন, তারা সিরিয়াস হলে এ অভ্যাস ত্যাগ করতে পারেন। মুদ্রাদোষ কারো মান বাড়ায় না, মর্যাদা বাড়ায় না, ব্যক্তিত্বকে ভারীও করে না, বরং প্রায় ক্ষেত্রে ব্যক্তির জন্য সমস্যার সৃষ্টি করে।

বিশ্বের যে সব পণ্ডিত মুদ্রাদোষ নিয়ে গবেষণা করেছেন, তারা মনে করেন, অধিকাংশ মুদ্রাদোষ ইচ্ছা করলে ত্যাগ করা যায়, হেরোইন আসক্তরা যখন হেরোইন সেবন-অভ্যাস ত্যাগ করতে পারে, তখন মুদ্রাদোষ ত্যাগ করা কঠিন নয়। তবে হ্যাঁ, অনেকের পক্ষে হয়তো সম্ভব হবে না। প্রত্যেকেরই কোন না কোন মুদ্রাদোষ আছে, অধিকাংশের মুদ্রাদোষ প্রকাশ পায় না, প্রকাশ পেলেও ধরা যায় না, অনেকের প্রকাশ পায় এবং ধরাও যায়। পার্থক্য শুধু এই।

কারো কোন মুদ্রাদোষ নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করা উচিত নয়। নাম বিকৃত করে কাউকে ডাকা যেমন অপরাধ, গুনাহ, হাদীসে স্পষ্ট মানা, মুদ্রাদোষ দিয়ে কাউকে উপহাস করা বা ব্যঙ্গ-কৌতুক করা সম্পূর্ণ অনুচিত। এমনও দেখা গেছে, বিদ্রুপকারী ব্যক্তির মধ্যে মুদ্রাদোষ দেখা দিয়েছে। আমার মধ্যে যে রোগ নেই, অন্যের মধ্যে আছে, এ জন্য তার রোগ নিয়ে মজা বা তামাশা করতে নেই, সে রোগ তো আমারও হতে পারে। আজ আমার মধ্যে কোন মুদ্রাদোষের প্রকাশ ঘটেনি, এ জন্য আল্লাহর পাকের কাছে শুকরিয়া আদায় করা উচিত। আজ এ নিয়ে অন্যকে তামাশা করলে দু'দিন পর আমিও এই তামাশার পাত্রে পরিণত হতে পারি। তাছাড়া ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করা সামাজিক অন্যায়, ধর্মীয় দিক থেকে গুনাহ, তা মনে রাখতে হবে। 'কারো মনে দিওনা আঘাত, সে আঘাত লাগে কাবার গায়ে'।

মুদ্রাদোষ থেকে আমাদের জন্য অনেক কিছু শিক্ষণীয় রয়েছে। ওর এ দোষ আছে, আমার এ দোষ নেই, তার এ দোষ দেখে আমি আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করে শোকর গোজার বান্দাহ হিসাবে নিজেকে উপস্থাপন করতে পারি।

www.pathagar.com

আমার এ দোষ নেই, এ জন্য শুকরিয়া আদায়ের সাথে সাথে অপরের প্রতি অর্থাৎ যাদের মুদ্রাদোষ রয়েছে, তাদের প্রতি সংবেদনশীল হতে পারি, তাদের জন্য দোয়া করতে পারি, এ অভ্যাস বা দোষ ত্যাগের মত হলে তা ত্যাগের জন্য ওদের সহায়তা করতে পারি। আল্লাহ এই ব্যাধি যে কোনজনকে দিতে পারেন, এ কথা স্মরণ করে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের প্রতি অন্তরে ভয় বাড়াতে পারি। মুদ্রাদোষ যত আদ্‌না দোষই হোক না কেন, তা একটা দোষ তো বটেই, সুতরাং যাদের এ দোষ আছে, সমাজে একটুখানি হলেও তারা দুর্বল থাকে। এই দুর্বলতার সুযোগ কারো নেয়া উচিত নয়, যাদের মুদ্রাদোষ নেই। কোন অসুস্থ লোককে দেখে উপহাস করতে নেই। আজ আমার দেহে এ অসুখ নেই, কাল যে তা হবে না, এ গ্যারান্টি কি কোন মানুষ দিতে পারে? মুদ্রাদোষের ব্যাপারেও একই কথা খাটে। আজ এ দেহে, কাল ঐ দেহে।

কোন অসুখ একজনের দেহে নেই, এ জন্য রোগমুক্ত ব্যক্তি অহংকার বা গর্ব করতে পারে না, শুকরিয়া আদায় করতে পারে। হতে পারে এই মুদ্রাদোষ মানুষের অহংকারকে দমন করার এক দাওয়াই। যাদের দোষ আছে, আর যাদের নেই, উভয়ের জন্য মুদ্রাদোষ অহংকার বিনাশী বিশেষ এক হরকত। মানুষ কখনো কোন দিক দিয়ে, কোন ব্যাপারে অহংকারী হতে পারে না। অহংকার করার মত কিছুই নেই মানুষের কাছে। অহংকার হচ্ছে আল্লাহ পাকের কুদতরী দেহের চাদর। এ চাদরে বান্দাহর হাত দিতে নেই।

মানুষের অহংকার করার মত কোন কিছুই যে নেই, তা কি আমরা ভেবে দেখেছি? প্রত্যেক মানুষই, তিনি রাজা-বাদশাহ শাহানশাহই হোন না কেন, তিনি ব্যক্তিগতভাবে মেথর নিজ দেহের, তিনি নাপিত নিজ দেহের একাংশের। অহংকারের মাথায় প্রচণ্ড আঘাত। অতঃপর অহংকার করার আর থাকলো কি?

মুদ্রাদোষ হয়তো হতে পারে অহংকারনাশক ছোট কোন বড়ি, যেমন নিজ দেহের মেথর ও নাপিত হওয়ার ব্যাপারটা অহংকার নাশক দু'টি জরুরি ওষুধ। রাজার মেথর রাজা, রাজার নাপিত রাজা, মানুষের অহংকার আর থাকে কোথায়? অনেকের মধ্যে মুদ্রাদোষ আছে, কিন্তু নিজ মুদ্রাদোষ অনেকে ধরতে পারেন না, অন্যরা ধরে ফেলে। আপনি-আমি কি এ দোষ থেকে মুক্ত?

www.pathagar.com

যে বয়সে শিশুরা বিস্কুটকে বলে 'বুক্কু'

শিল্পোন্নত দেশগুলোতে মানুষের কর্মব্যস্ততা খুব বেশি। বলার অপেক্ষা রাখে না, শিল্পোন্নত সব দেশই অমুসলিম সরকার দ্বারা পরিচালিত। প্রত্যেকটি দেশেই খ্রিস্টানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। নারী-পুরুষ সকলেই চাকরি, ব্যবসা এবং বিভিন্ন পেশায় কর্মরত। নারী-পুরুষের এই কর্মব্যস্ততার কারণে নিজেদের শিশু সন্তান লালন-পালনের সমস্যা দেখা দেয়। শিশুদের লালন-পালনের জন্য সহজে তারা চাকর-চাকরাণীও পান না। তাছাড়া বিশ্বস্ততার প্রশ্নটিও এ সমস্যার সঙ্গে জড়িত। যারা এ সমস্যার সমাধান করতে পারেন, তাদের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। অধিকাংশ মা-বাবা বিশেষ করে মায়েরা এই সংকটে ভোগেন। কারণ, মায়েদের অতি সকালে নিজ নিজ পেশাস্থলে হাজির হতে হয়। এই সমস্যাটি সমাধানের জন্য গড়ে উঠেছে শিশু লালন কেন্দ্র। মায়েরা কর্মস্তলে যাওয়ার পথে নিজ নিজ শিশুকে ঐ সব কেন্দ্রে রেখে যান। ফেরার পথে শিশুদের নিজ গৃহে নিয়ে আসেন। যারা শিশু লালন কেন্দ্র খুলছেন তারা পান মাসোহারা।

www.pathagar.com

যে বয়সে শিশুরা বিস্কুটকে বলে 'বুক্কু'

যে বয়সের শিশুরা বিস্কুটকে বলে 'বুক্কু', 'আমার'কে বলে 'আমাল', চকলেটকে বলে 'চকেত' আর ঘরকে বলে 'ঘল'; যে বয়সের শিশুরা থাকে অনেকক্ষণ কোলে, কিছুক্ষণ ঘুমে আর কিছুক্ষণ থাকে হৈ-চৈ এবং টুকুর টুকুর দৌড়াদৌড়ি এবং খেলাধূলায় মহাব্যস্ত, সেই বয়সের (শহরের) শিশুর অনেক মা-বাবা তাদের সন্তানদের স্কুলে ভর্তির জন্য খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েন এবং ভর্তিও করিয়ে থাকেন। শিশুর মুখে কথা ফুটলেই অনেক মা-বাবা মনে করেন, স্কুলে যাওয়ার বয়স হয়েছে। প্রশ্ন রাখি, এই বয়স কি সন্তানের লেখাপড়ার বয়স? এই বয়স কি সন্তানের পাঠাভ্যাস গঠনের বয়স? আমার উত্তর হচ্ছে; না, এই বয়স যেমন লেখাপড়ার বয়স নয়, তেমনি নয় পাঠাভ্যাস গঠনের বয়সও। এই বয়স দেহের পরিপুষ্টি আর মগজ পুষ্টির বয়স।

আমার এই জবাবের পক্ষে যুক্তি ও ব্যাখ্যা আছে। কেন এই বয়সের শিশুদের বিদ্যালয়ে পাঠনো হয়, তারও কারণ ও ইতিহাস আছে। এই শিশুদের বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে শিশুদের মায়েরা সন্তানদের লেখাপড়ার সুযোগ করে দেন, না মায়েরা কিছুক্ষণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন, সে সম্পর্কেও কথা আছে। এই আলোচনাতেই আমি সব কথা সংক্ষেপে বলার চেষ্টা করবো। পাঠকদের মধ্যে যারা আমার সঙ্গে একমত হবেন না, তারা তাদের নিজ নিজ অভিমতটা আমাকে মেহেরবানী করে জানাবেন।

এই আলোচনা করার ইচ্ছা আমার হয়েছে একটি জাতীয় দৈনিকে দু'টি ছবি দেখে। প্রথম ছবির বর্ণনাটা হচ্ছে এই, ভর্তি পরীক্ষা শেষে তিন বছরের একটি শিশু তার অভিভাবককে খুঁজে পাচ্ছে না। জুড়ে দিয়েছে কান্না। স্কুল কর্তৃপক্ষ পড়েছেন বিপাকে। শিশুটি শুধু কাঁদে আর কাঁদে। এ অবস্থায় শিশুটিকে উঁচু করে ধরে পরীক্ষা কেন্দ্রের এক স্বেচ্ছাসেবক চিৎকার করছেন– শিশুটি কার?

দ্বিতীয় ছবিতেও প্রায় অনুরূপ ঘটনার দৃশ্য। একটি শিশু তার অভিভাবককে খুঁজে পাচ্ছে না। একজন শিক্ষক মাইকে তার অভিভাবককে যোগাযোগ করতে বলছেন। এই দৃশ্যে অবশ্য শিশুটিকে কাঁদতে দেখা যাচ্ছে না, তবে তার বয়সও চার বছরের বেশি নয়।

www.pathagar.com

বিস্কুটকে 'বুক্কু' আর আমারকে 'আমাল' উচ্চারণের বয়স যে সব শিশুর, সেই শিশুদের কেন আমরা পাঠাচ্ছি বিদ্যালয়ে? এ জিজ্ঞাসার জবাবে যা বলা যায় তা রীতিমত এক ইতিহাস। এই ইতিহাস বলার আগে আমার মত বুড়োদের শৈশবকালের ইতিহাস বলা প্রয়োজন বোধ করি।

সিলেট জেলার যে এলাকায় আমার জন্ম, সেই এলাকায় একটা রেওয়াজ ছিল এই, নামায শিক্ষা এবং কায়দা আমপারা শেষ না করা পর্যন্ত বিদ্যালয়ে সাধারণত কোন অভিভাবক সন্তানদের পাঠাতেন না। কোন কোন অভিভাবক নিজ নিজ শিশুকে পবিত্র কুরআন শরীফ এক খতম না হওয়া পর্যন্ত বিদ্যালয়ে পাঠাতেন না। এই নিয়ম মানার ব্যাখ্যা ছিল এই, স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর দ্বীনি ইলিম তা'লীম অর্জন করা সম্ভব নয়। কারণ, দু'দিকের পড়ার চাপ সামাল দেয়া শিশুর পক্ষে সম্ভব হবে না। তাই প্রাথমিক দ্বীনি ইলিম অর্জনের ওপর অধিক গুরুত্ব দেয়া হত। এই যুক্তিই যে সঠিক, তার অনেক প্রমাণও রয়েছে। যে অভিভাবক শিশুদের এই পদ্ধতিতে শিক্ষা না দিয়ে সরাসরি স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিতেন, পরবর্তী জীবনে দেখা গেছে এরা নামায জানে না, তাদের কোন সূরা কালাম মুখস্থ নেই। অবশ্য এই অজ্ঞতাকে দূর করার উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত উদ্যোগে কেউ কেউ দোয়া-কালাম শিখেছেন। কিন্তু তাদের সংখ্যা নগণ্য। আমাদের সময়ে ৫/৬ বছরের আগে স্কুলে ভর্তির বয়স হয়েছে বলে অভিভাবকরা মনে করতেন না। আজকাল সেই রেওয়াজ প্রায় নেই বললেই চলে। তবে কোন কোন পরিবার এখন ঐ ঐতিহ্য ধরে রেখেছেন। আমি খবর নিয়ে জেনেছি, অনেক জেলার অনেক এলাকায় সেকালে এই রেওয়াজ চালু ছিল। অর্থাৎ প্রথমে দ্বীনি তা'লীম, তারপর সাধারণ তা'লীম। বর্তমানে তিন বা সাড়ে তিন বছরের শিশুকে স্কুলে পাঠাবার যে অদম্য আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে, সেই ইতিহাস আমাদের জন্য বড়ই শরমের।

শিল্পোন্নত দেশগুলোতে মানুষের কর্মব্যস্ততা খুব বেশি। বলার অপেক্ষা রাখে না, শিল্পোন্নত সব দেশই অমুসলিম সরকার দ্বারা পরিচালিত। প্রত্যেকটি দেশেই খ্রিস্টানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। নারী-পুরুষ সকলেই চাকরি, ব্যবসা এবং বিভিন্ন পেশায় কর্মরত। নারী-পুরুষের এই কর্মব্যস্ততার কারণে নিজেদের শিশু সন্তান লালন-পালনের সমস্যা দেখা দেয়। শিশুদের লালন-পালনের জন্য সহজে তারা

www.pathagar.com

চাকর-চাকরাণীও পান না। তাছাড়া বিশ্বস্ততার প্রশ্নটিও এ সমস্যার সঙ্গে জড়িত। যারা এ সমস্যার সমাধান করতে পারেন, তাদের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। অধিকাংশ মা-বাবা বিশেষ করে মায়েরা এই সংকটে ভোগেন। কারণ, মায়েদের অতি সকালে নিজ নিজ পেশাস্থলে হাজির হতে হয়। এই সমস্যাটি সমাধানের জন্য গড়ে উঠেছে শিশু লালন কেন্দ্র। মায়েরা কর্মস্তলে যাওয়ার পথে নিজ নিজ শিশুকে ঐ সব কেন্দ্রে রেখে যান। ফেরার পথে শিশুদের নিজ গৃহে নিয়ে আসেন। যারা শিশু লালন কেন্দ্র খুলছেন তারা পান মাসোহারা। এই ব্যবস্থায় উভয় পক্ষের লাভ। দ্বিপাক্ষিক স্বার্থনিহিত। শিশুর অভিভাবকরা নিশ্চিন্তে অফিস করেন।

এই ব্যবস্থা কিছুকাল চলার পর অভিভাবকরা একে একটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেন। শিশু লালন কেন্দ্রগুলোকে বিদ্যালয়ে রূপান্তর ঘটানো হয়। কেন্দ্রগুলো দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়। একটির নাম রাখা হয় প্লে গ্রুপ, অন্যটির নাম রাখা হয় নার্সারী গ্রুপ। শিশুরা প্লে গ্রুপ এবং নার্সারী গ্রুপের ছাত্র হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়। এই শিশুদের ছাত্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাদের মা অথবা বাবা কর্মস্থল থেকে ফিরে আসার পূর্ব পর্যন্ত স্কুল কর্তৃপক্ষ শিশুদের নানা প্রকার খেলাধূলায় ভুলিয়ে রাখেন। যখন তারা প্লে গ্রুপ এবং নার্সারী গ্রুপের বয়সসীমা অতিক্রম করে তখন শিক্ষার্থী হিসেবে বিদ্যালয়ে প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীতে ভর্তি করা হয়। আগের বছরগুলোতে শুধু এই রাখালী ছাড়া আর কিছুই করা হয় না। এ হচ্ছে শিল্পোন্নত দেশগুলোতে স্কুলে ভর্তি করার কারণ, উদ্দেশ্য ও ইতিহাস।

আমাদের দেশে কেন এই রেওয়াজ চালু হলো? আমাদের দেশে চাকরিজীবী মহিলার সংখ্যা অতি নগণ্য। দশমিকের হিসেবেও উল্লেখ করা যায় না। শহরের অধিকাংশ মহিলা গৃহিণীমাত্র, তারা কেন নিজ নিজ অবুঝ শিশুদের প্লে গ্রুপ আর নার্সারী গ্রুপে ভর্তি করে দেন? এছাড়া তারা কি এমন ব্যস্ততা থেকে অব্যাহতি পান আর এ সময়ে কোন্ কাজটি করেন? অনেকে বলেন, সকাল বেলায় শিশুদের কান্নাকাটি বা জ্বালাতন থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য এই বিদ্যালয় নামক শিশু নার্সারীতে মায়েরা তাদের সন্তানকে রেখে দেন। এই মানসিকতা সকলে পোষণ করেন তা অবশ্য বলি না, তবে অনেকে করেন তা অবশ্য সঠিক। অনেকে আবার

www.pathagar.com

এ ব্যবস্থাকে মেনে নিয়ে সামাজিক স্ট্যান্ডার্ডও বৃদ্ধি করেন। কারণ, পাশের বাসার আপা তার শিশু সন্তানকে এ ধরনের একটি বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে থাকেন। সন্তানকে রোজ আনা-নেয়ার ওছিলায় তিনি সাজগোজ করে বাসা থেকে বের হোন। আমি তার থেকে কম কোন্ দিক দিয়ে? সুতরাং পাশের বাসার আপার মত যদি আমি নিজ সন্তান স্কুলে পাঠিয়ে সাজগোজ করে বাসা থেকে বের না হই, তাহলে প্রগতিবাদিনী তো হতে পারছি না। অভিজাত হওয়ার দৌড়ে তো পিছিয়ে যাবো। ঐ আপার ছেলেটি ৫০০ টাকার মাহিনার স্কুলে লেখাপড়া করে। আমার ছেলে কি অবৈতনিক স্কুলে অথবা কম মাহিনার স্কুলে লেখাপড়া করতে পারে? মান-ইজ্জত বলে তো একটা কথা আছে।

বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, এই মানসিকতাও অনেককে এই পথ ধরতে বাধ্য করেছে। কোন এক কবি বলেছেন, পশ্চিম খুলে দিয়েছে দ্বার, সেথা হতে আসে শুধু উপহার। যথার্থ কথা, পশ্চিম আমাদের অনেক উপহার দেয়। যা আমদানি হয় আমরা সবগুলোকে উপহারই মনে করি। একটু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেও দেখি না যে, এসব উপহার আমাদের ব্যবহারের উপযোগী কি না। তিক্ত হলেও সত্য যে, অধিকাংশ উপহারই আমাদের ব্যবহারের উপযোগী নয় বরং আমাদের জন্য ক্ষতিকারক। পশ্চিমা দেশের সমাজ ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে তারা যে ব্যবস্থার প্রবর্তন করে থাকেন, তা তাদের সমাজ ব্যবস্থার জন্য উপযোগী, কিন্তু তাদের উপযোগী সব ভাল ভাল ব্যবস্থা আমাদের জন্য সবই উপযোগী নয় বরং ক্ষতিকারক এবং বিপজ্জনক। সামাজিক প্রেক্ষাপট তাদের চেয়ে আমাদের ভিন্ন। তবুও আমরা ফরাসি কায়দায় হাসি, মার্কিনী কায়দায় কাশি আর ফিরিঙ্গী কায়দায় দু'পা ফাঁক করে জীব বিশেষের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পেশাব করি। সেই 'পশ্চিমী কায়দায়' আমরা অপ্রয়োজনে প্লে গ্রুপ আর নার্সারি স্কুল গড়ে তুলেছি। অপ্রয়োজনে ঠিক বলা যাবে না, প্রয়োজন আছে, তবে এই প্রয়োজন একটু ভিন্ন ধরনের। এই প্রয়োজনের ব্যাখ্যা করছি। মতামত পাঠকরাই দেবেন।

প্রয়োজনটা হচ্ছে এই, এ শ্রেণীর বেপর্দা ললনার ঘর থেকে বের হওয়ার এই হচ্ছে একটা মোক্ষম সুযোগ। এই নার্সারি আর প্লে গ্রুপ ব্যবস্থা সে সুযোগটা তাদের দিয়েছে। তথাকথিত আধুনিক মহিলারা বিদেশী নানা প্রকার কসমেটিক

www.pathagar.com

ব্যবহার করেন, ফরাসি সৌরভ তো অবশ্যই। ঘরের গৃহিণী হিসেবে প্রত্যহ এসব ব্যবহারের সুযোগ তাদের নেই। মাসে দু'একবার দূরের কোন বাসায় বেড়াতে কসমেটিক ব্যবহার করেন। এই সুযোগ না আসলে কসমেটিকের বাক্সগুলো অব্যবহৃত অবস্থায় পড়েই থাকে। কারণ, বাসায় শত কাজের মাঝে এগুলো ব্যবহার করার সুযোগ ও অবকাশ থাকে না। এই প্লে গ্রুপ আর নার্সারি ব্যবস্থা চালু হওয়ার ফলে এই সব মহিলা প্রতিদিন সন্তানদের বিদ্যালয়ে নিয়ে যান এবং বাসায় নিয়ে আসেন নিজেরা অত্যাধুনিক ম্যাকআপে সজ্জিত করে। এ সুযোগ তারা পেয়েছেন এই ব্যবস্থাতে।

তাদের দ্বিতীয় সুযোগটি হচ্ছে এই, অনেক আধুনিক মহিলার ডজন ডজন এমনকি শত শত শাড়ি আছে। বছরে দু'চারবার আত্মীয়দের বাসায় যেতে ৫/৭টি এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দেয়া সত্ত্বেও কয়েকখানা মাত্র ব্যবহার করা হয়। বাদ বাকি কয়েক ডজন শাড়ি আলমারীতেই পড়ে থাকে। শখের কেনা এত শাড়ি যদি প্রদর্শনই না করা গেল, তাহলে সব শখই তো মাটি। এই শ্রেণীর মহিলার শাড়ি প্রদর্শনীর উত্তম ব্যবস্থা হলো দিনে দু'একবার শিশু ছেলে বা মেয়েকে নিয়ে স্কুলে যাতায়াত করা। প্রতিদিন এই ব্যবস্থায় অন্তত একখানা নতুন শাড়ি দেখাবার সুবর্ণ সুযোগ পাওয়া যায়।

তৃতীয় কারণটি হচ্ছে, নিজ গৃহের জৌলুস, সচ্ছলতা বা ভালমন্দ অন্যদের কাছে পরিবেশন করা এবং অন্য আপাদের গৃহের বিভিন্ন খবর অবহিত হওয়ার একটা চান্স নেয়া। আরো বহু প্রয়োজন তারা পূরণ করে থাকেন এই ব্যবস্থায়, এখানে এত কথা বলার মত পরিবেশ নেই। এসব স্কুল ছুটি হওয়ার প্রায় এক ঘণ্টা আগে এই ধরনের আপাদের মেলা বসে স্কুল গেইটে।

নানা গল্প-গুজব, কথাবার্তা, একে অন্যের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন, ভাবের আদান-প্রদান। কার ক'খানা শাড়ি আছে, কে এই মাসে ক'খানা নতুন ডিজাইনের শাড়ি কিনেছেন, কার বাসায় কি বাজার এসেছে, মাছ না গোশত, কোন্ তরকারি কার স্বামী পছন্দ করেন, কার স্বামী কেমন, কার ছেলে কেমন, কার মেয়ে কেমন

www.pathagar.com

ইত্যাদি হাজারো প্যাঁচাল। প্যাঁচালে প্যাঁচালে সময় কাটে। এ যেন 'আজাইরা' মহিলাদের বাজারী প্যাঁচালের সকালের আসর। এই মেলার একটু তফাতে বেকার যুবকদেরও মেলা বসে। এ সব সকালের মেলায় দু'চারটি ঘর ভাঙ্গার ঘটনাও ঘটেছে বলে পত্রপত্রিকা মারফত জানা যায়।

এই তো হলো প্লে গ্রুপ আর নার্সারী গ্রুপের শিশুদের লেখাপড়া আর তাদের মায়েদের রুটিন মাফিক ডিউটির খবরাখবর। এরপর পাঠকদের কাছে প্রশ্ন রাখছি, বলুন তো পশ্চিমা দুনিয়ায় এ ব্যবস্থার প্রয়োজন থাকলেও আমাদের দেশে কি এসবের প্রয়োজন আছে শুধু উপরোক্ত কারণগুলো ছাড়া?

শিশুদের মগজ পরিপক্ক হওয়ার আগেই বইয়ের বোঝা তাদের মাথায় চাপিয়ে দেয়া আর শৃঙ্খলার শৃঙ্খলে শিশু সুলভ চপলতাকে বাঁধা কতটুকু সমীচীন, তা এই সব শিশুর মা-বাবার কাছে প্রশ্ন রেখে বিদায় নিচ্ছি। মুসলমান ঘরের শিশুরা এদিকে দ্বীনি প্রাথমিক ইল্‌মি আমল থেকে যে বাদ পড়ছে সেদিকটাও কি ভেবে দেখা উচিত নয়?

www.pathagar.com

যত গুড় তত কি মিষ্টি হয়?

'যত গুড় তত মিষ্টি'—এটা বলতে পারেন একটা কথার কথা অথবা বলতে পারেন সামাজিক রসিকতা। ঘুষখোরদের মাহিনা দ্বিগুণ, তিনগুণ বা চার-পাঁচগুণ বাড়িয়ে দিলেও তারা ঘুষ খাবেই, ঘুষ খাওয়ার অভ্যাস তাদের রক্তের মধ্যে মিশে আছে। টাকা নামক মিষ্টিতে ওদের ডুবিয়ে রাখলেও ঘুষ-অভ্যাস থেকে তারা মুক্ত হবে না। 'যত গুড় তত মিষ্টি'—এ কথার ব্যবহারিক বাস্তবতাও আছে, তা স্বীকার করি। যেমন ভাল ফল পেতে হলে অধিক শ্রম দিতে হয়, পরিচর্যায় মনোযোগী হতে হয়। ভাল ঘরে বাস করতে হলে ভাড়াটাও মোটা অংকের গুণে দিতে হয়, ভাল খেতে হলে ভাল পয়সা খরচ করতে হয়। এসব দিক বিবেচনা করে বলা যায় 'যত গুড় তত মিষ্টি'। কিন্তু গুড়ের যে একটা চূড়ান্ত মিষ্টি আছে, এই চূড়ান্ত মিষ্টি হয়ে যাওয়ার পর যতই গুড় ঢালা হোক না কেন, মিষ্টি মোটেই বৃদ্ধি পাবে না, বরং গুড়ের হবে অপচয়। শুধু তাই নয়, অধিক গুড়ের ব্যবহারের কারণে পেটে গোলমাল বাধতে পারে, এমনকি ডাক্তারের শরণাপন্নও হতে হবে। তাই 'যত গুড় তত মিষ্টি' আক্ষরিক অর্থে ও সঙ্গত কারণেই মানা যায় না।

www.pathagar.com

পরিবর্তন-প্রক্রিয়া প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষার জন্য অপরিহার্য। এ জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার কুদরতী নিয়মে সে ব্যবস্থা করে রেখেছেন। এ পরিবর্তনের মাধ্যমে সৃষ্টির যা কিছু স্বাভাবিক চলমান ধারার অন্তর্ভুক্ত, তা সক্রিয় ও নিখাদ হয়। এই পরিবর্তনের মধ্যেও অনেক কিছুর পরিবর্তন নেই। চাঁদ, সুরুজ, সিতারা, আসমান বদলায় না, গ্রহ-নক্ষত্রের নিজ নিজ কক্ষপথে চলার গতি-প্রকৃতি কখনো বদলায় না। নদীর বাঁক বদলায়, নদীর একুল ভাঙ্গে ওকুল গড়ে, জোয়ার ভাটা হয়, কিন্তু বহমান নদী থেমে থাকে না, সাগরের বুকে আশ্রয় না নেয়া পর্যন্ত তার শান্তি নেই। এক কথায় বলা যায়, এই দুনিয়ায় যা পরিবর্তনের দরকার তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পরিবর্তন করে দেন, যা পরিবর্তনের নয়, পরিবর্তন করলে সৃষ্ট জগতে বিপর্যয় সৃষ্টি হবে, তা পরিবর্তন করেন না। কিন্তু মানুষের সমাজে, যা মানুষের নাগালের মধ্যে, যা মানুষের ব্যবহারের মধ্যে, যা মানুষকে ঘিরে, যা মানুষের দ্বারা পরিবর্তন হতে পারে, সদা সর্বদা পরিবর্তন চলছে। চাঁদ-সুরুজ-সিতারা না বদলালেও ইনসান বদলে যাচ্ছে, ইনসানের মূল্যবোধ বদলাচ্ছে, ভাষা বদলাচ্ছে, পথঘাট বদলাচ্ছে। হাজার বছর আগে আমাদের পূর্ব পুরুষরা যে উচ্চারণ ও শব্দের বাংলা ভাষায় কথা বলতেন, লিখতেন ও পড়তেন, আমরা সে উচ্চারণের শব্দে কথা বলি না, লিখি না এবং পড়ার মত এ ধরনের বইও তেমন দেখি না। এই ৬০/৭০ বছর আগেও যে সব প্রবাদ বাক্য মুখে মুখে ফিরতো, লোকে এই প্রবাদ বাক্যের মর্ম উপলব্ধি করে তৃপ্তি পেত, আজ এসব প্রবাদ বাক্যের কোন কোনটি উচ্চারণে বাধা পায়। কারণ, প্রাচীন কিছু প্রবাদ বাক্য আছে, প্রাচীন কালেই তা সব দিক দিয়ে অর্থবহ ছিল, আজকাল কোন কোনটির চিরন্তনী আবেদন লোপ পেয়েছে। অটোমেটিক পরিবর্তন এসেছে তা বলা যেতে পারে। এক সময় বলা হতো 'চোরের বাড়িতে দালান ওঠে না'। আজকাল কিন্তু দেখা যায়, অধিকাংশ বিশাল বিশাল দামী ইমারতের মালিক জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চোর, দস্যু, চোরাকারবারী, হাইজ্যাকার, ঘুষখোর ও দুর্নীতিবাজরা। যে সৎ তার বাড়িতে দালান খুবই কম দেখা যায়। আগে বলা হতো 'সবুরে মেওয়া ফলে' এ কথা হয়তো বিশেষ ব্যাখ্যায় আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে সঠিক, কিন্তু জাগতিক ক্ষেত্রে বর্তমান জগতে তার প্রয়োগের বিরূপ ফল দেখা যায়। অধিক সবুরে মেওয়া পাওয়া তো দূরের কথা, মেওয়া পচে যায়। 'যত গুড় তত মিষ্টি' এ কথা সর্বাংশে ঠিক নয়। মিষ্টি

www.pathagar.com

হওয়ার শেষ একটা মাত্রা আছে, তারপর যতই গুড় ঢালা হোক, মিষ্টি একই থাকবে।

এভাবে অনেক কিছুতে পরিবর্তনের ঢেউ লেগেছে, পরিবর্তন হচ্ছে। মুখের ভাষায়, শব্দে, বাক্য বিন্যাসে পরিবর্তন এসেছে, প্রবাদ বাক্যেও এসেছে। পরিবর্তন এসেছে সম্বোধনে ও সম্পর্কে। এই তো ধরুন আমার কথা। আমি ৫০ বা ৬০ বছর আগে যেমন ছিলাম, তেমন কি এখন আছি? ২০ বছর আগেও যেমন ছিলাম, তেমন এখন নেই, অবশ্য এই পরিবর্তন প্রধানত দৈহিক। কাঁচা চুল-দাড়ি সাদা হয়েছে। পৃথিবীটা চিরতরে ছেড়ে যাওয়ার তৃতীয় নোটিশ আমার হস্তগত হয়েছে। যাত্রার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতে হবে সে ইঙ্গিত রয়েছে নোটিশে, তবে নোটিশে সময় দেয়া হয়নি, এ জন্য উৎকণ্ঠা বেশি। চোখের জ্যোতি কমে গেছে, দাঁত পড়ে যাচ্ছে, চুল-দাড়ি সাদা হয়েই গিয়েছে—এই তিনটি অবস্থা বান্দার জন্য তিনটি নোটিশ। এর মানে পরিবর্তনের আরও কিছু কথার প্যাঁচাল পাড়ি। অনেক পরিবর্তন যেমন আমাদের জন্য কল্যাণকর, তেমনি অনেক পরিবর্তন অকল্যাণকর।

আমাদের সমাজ জীবনে সম্পর্ক স্থাপনে আর সম্বোধনে নানা মাত্রা যোগ হয়েছে এবং হচ্ছে। সম্বোধনে প্রথমে সৃষ্টি হয়েছে নানা আবর্তন, তারপর বিবর্তন, এখন ঘটছে পরিবর্তন। কিন্তু এত বিবর্তন আর পরিবর্তনের পর যা পাওয়া যাচ্ছে, তাতে স্বাভাবিক সতেজ হৃদয়ের স্পন্দন তেমন নেই। কিন্তু ঠাটবাটে সাজগোজে আর অলংকরণে মনে হয় অদ্বিতীয়। কোয়ান্টিটি বাড়ছে, কিন্তু কোয়ালিটি কমছে। ভাষা কোন কোন ক্ষেত্রে সুন্দর হচ্ছে, ভাবেও রোমান্টিকতা আসছে, কিন্তু সম্পর্কের জোড়াটা কেমন যেন নড়বড়ে। ভাষার সুন্দরের সাথে হৃদয়ের সংযোগ ঘটছে না।

'যত গুড় তত মিষ্টি' বলতে আমাদের সমাজে একটা কথা আছে। 'যত গুড় তত মিষ্টি' আক্ষরিক বা আভিধানিক অর্থেও এ প্রবাদ বাক্য সর্বক্ষেত্রে সঠিক নয়। সম্বোধনের ভাষা মিষ্টি হলেই সম্পর্কও যদি মিষ্টি হয়, তাহলে উত্তমের চেয়ে উত্তম তাতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু এমনটি যে হবে তা বলা যায় না। 'যত গুড় তত মিষ্টি'—এটা বলতে পারেন একটা কথার কথা অথবা বলতে পারেন সামাজিক রসিকতা। ঘুষখোরদের মাহিনা দ্বিগুণ, তিনগুণ বা চার-পাঁচগুণ বাড়িয়ে দিলেও তারা

www.pathagar.com

ঘুষ খাবেই, ঘুষ খাওয়ার অভ্যাস তাদের রক্তের মধ্যে মিশে আছে। টাকা নামক মিষ্টিতে ওদের ডুবিয়ে রাখলেও ঘুষ-অভ্যাস থেকে তারা মুক্ত হবে না। 'যত গুড় তত মিষ্টি'—এ কথার ব্যবহারিক বাস্তবতাও আছে, তা স্বীকার করি। যেমন ভাল ফল পেতে হলে অধিক শ্রম দিতে হয়, পরিচর্যায় মনোযোগী হতে হয়। ভাল ঘরে বাস করতে হলে ভাড়াটাও মোটা অংকের গুণে দিতে হয়, ভাল খেতে হলে ভাল পয়সা খরচ করতে হয়। এসব দিক বিবেচনা করে বলা যায় 'যত গুড় তত মিষ্টি'। কিন্তু গুড়ের যে একটা চূড়ান্ত মিষ্টি আছে, এই চূড়ান্ত মিষ্টি হয়ে যাওয়ার পর যতই গুড় ঢালা হোক না কেন, মিষ্টি মোটেই বৃদ্ধি পাবে না, বরং গুড়ের হবে অপচয়। শুধু তাই নয়, অধিক গুড়ের ব্যবহারের কারণে পেটে গোলমাল বাধতে পারে, এমনকি ডাক্তারের শরণাপন্নও হতে হবে। তাই 'যত গুড় তত মিষ্টি' আক্ষরিক অর্থে ও সঙ্গত কারণেই মানা যায় না।

আলোচনার শুরুতে সম্পর্ক-সম্বোধনের কথা বলেছিলাম। বাঙালি মুসলিম সমাজের মধ্যে এখন তরল মিষ্টি রসের সঞ্চার ঘটেছে। এই মিষ্টি রস দেখে অনেকে মন্তব্য করেন, এত মিষ্টি ঠিক নয়। কম মিষ্টি ভাল। ডায়াবেটিসের দোষ যে সব দেহে আছে, তাদের জন্য তো মিষ্টি হচ্ছে বিষ। তাছাড়া বেশি মিষ্টি হলে ভোগ্যবস্তু উপাদেয় হয় না।

'মা-বাবা' দুনিয়ার সবচেয়ে মিষ্টি সম্বোধন। কিন্তু উপমহাদেশ ভাগ হওয়ার পর কোন ফাঁকে বাহিরের মানুষের সঙ্গে মেলামেশার কারণে মা-বাবা হয়ে গেলেন 'আম্মা-আব্বা'। এ সম্বোধনও মধুর সম্বোধন। আমাদের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের কাছাকাছি। কেউ কোন প্রতিবাদ করেননি। প্রত্যেকে মেনে নিয়েছেন। বাপজান, বাবাজান, বাজী এসব সম্বোধন 'দেহাতীদের' জন্য রাখা হয়েছে। কিছু দিন পর দেখা গেল, এই সম্বোধনকে আরও মিষ্টি করার জন্য আম্মার পরিবর্তে আম্মু, আব্বার পরিবর্তে আব্বু চালু হয়ে গেল। আগামীতে এই সম্বোধনে আবার কি পরিবর্তন আসে তা বলা যায় না, তবে তথাকথিত বড়লোকদের পরিবারে পাপা, মাম্মি, ড্যাডি চালু হয়ে গেছে। সিনেমা ও নাটকেও উচ্চারিত হচ্ছে। চাচি, মামী, ফুফু, খালা সমাজ থেকে তাড়া খেয়ে বিদায় নিতে শুরু করেছেন। পশ্চিমা আন্টি

www.pathagar.com

একা এসে সবাইকে বিদায় করে দিয়েছে। চাচি উচ্চারণ করলে বুঝা যেত তিনি বাপের ভাই চাচার স্ত্রী। মামী সম্বোধন করলে বুঝা যেত তিনি মায়ের ভাইয়ের স্ত্রী, ফুফু সম্বোধন শুনলেই বুঝা যেত তিনি বাপের বোন আর খালা সম্বোধনে স্পষ্ট হয়ে উঠতো ইনি মায়ের বোন। এখন আন্টি শুনলে আপনাকে কয়েকটি প্রশ্ন করে জেনে নিতে হবে, এই মহিলার সঙ্গে সম্বোধনকারীর প্রকৃত সম্পর্ক কি?

হাট-বাজারে, অফিস-আদালতে কোথাও আজকাল চাচা পাওয়া যাচ্ছে না। আংকেলদের প্রচণ্ড ভিড়ের কারণে 'চাচা আপনা জান বাঁচাতে গিয়ে' কোথায় যে লুকিয়ে আছেন, তা বলা যাচ্ছে না। সব জায়গায় শুনবেন আংকেল সম্বোধন। কম বয়সের লোকজন বেশি বয়সের লোকজনকে আংকেল সম্বোধন করছেন হর-হামেশা। ফুটপাতের জুতা-পালিশওয়ালা ডাকছে আসুন আংকেল জুতা পালিশ করে দেই। কাঁচা বাজারে গেলে বা মাছের বাজারে ঢুকলে শুনবেন, 'ভাগিনা ভাতিজাদের' আংকেল সম্বোধন। আমি আগে এ সব সম্বোধন শুনে বিরক্ত বোধ করতাম, প্রতিবাদও করতাম, কিন্তু এখন বিরক্তি বোধ করলেও প্রতিবাদে তেমন মুখর হয়ে উঠি না। কারণ, যাদের জানি পশ্চিমা সংস্কৃতির বিরোধী, তারাও আন্টি-আংকেল বলছেন অহরহ। এ অবস্থা দেখে মনে করলাম, একা আমি এই মহামারীর মুকাবিলা কিভাবে করবো, নীরবই হয়ে যাওয়া উচিত। তাই নীরব থাকছি। পশ্চিমা আন্টিতো রান্নাঘর পর্যন্ত ঢুকেছে। ভাইজানও বিদায় হয়েছেন। হাটে-বাজারে গেলে শোনা যায়, 'হ্যালো ব্রাদার' সম্বোধন। বুবুজান, বুবু, বুবাই—এসব সম্বোধনের স্থান দখল করেছে 'আপা'। আপা তুর্কি শব্দ। আজকাল এই আপার রূপান্তর ঘটতে শুরু করেছে। আপা হয়ে গেছেন 'আপু'। সম্বোধনকে অধিকতর মিষ্টি করার জন্য যতটুকু সম্ভব ততটুকু গুড় ঢালা হচ্ছে, কিন্তু মিষ্টি বাড়ছে না। যেমন ছিল তেমন আছে। অধিক মিষ্টির একটা প্রতিক্রিয়া তো আছে। আগে রেডিও-টিভির উপস্থাপকরা কোন গুরুত্বপূর্ণ উপস্থাপনায় বা খেলার ধারাভাষ্য দেয়ার শুরুতে বলতেন 'প্রিয়দর্শক', এখন বলেন 'সুপ্রিয় দর্শক'। মানে 'প্রিয় দর্শক'কে আরও মিষ্টি করার জন্য 'সু'-যোগ করে গুড় ঢালা হচ্ছে কিন্তু মিষ্টি তো বাড়ছে না। সংবর্ধনা এখন সুসংবর্ধনা আর প্রভাত তো সুপ্রভাত হয়েই আছে। শুভ

www.pathagar.com

সন্ধ্যা আর শুভ রাত্রিতো আগেই মিডিয়াতে ঢুকে পড়েছে বিবিসি'র মাধ্যমে। সুলেখা কালিতে ভাল লেখা না হলেও 'সুলেখা' লেবেল বেশ সুন্দরভাবে সাঁটা থাকে।

ইসলাম নিয়ে যারা জীবন-যাপন করতে চান, বাঁচতে চান, ইসলাম নিয়ে মরতে চান, ইসলামের ছায়াতলে তাদের বংশধরদের রাখতে চান, তাদের মধ্যেও যখন দেখা যায় আংকেল আন্টির সম্বোধন-প্রীতি, তখন মনটাতে খুবই আঘাত লাগে।

প্রয়োজনে পরিবর্তন অবশ্যই গ্রহণযোগ্য, যদি সে প্রয়োজন আমার মৌল শিঁকড়ের সঙ্গে সাংঘর্ষিক না হয়। কিন্তু আফসোস, এই দিকটি অনেকেই ভেবে দেখেন না। কোন হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও ইহুদি পরিবার মুসলমানদের সমাজে প্রচলিত সম্বোধন একটিও গ্রহণ করেনি, মুসলমান নাম রাখেনি অথচ মুসলমানদের মধ্যে লাখ লাখ হিন্দু, খ্রিস্টান রয়েছে। ধন্যবাদ তাদের সতর্কতা ও সচেতনতার জন্য। তাদের নামই শুধু রাখি না, আমরা তাদের সংস্কৃতিও অনুসরণ করি। তাদের প্রতিনিধি হয়ে যেন জীবিত আছি। তারা আমাদের অনুকরণে মুসলিম নাম রাখে না, মুসলিম কোন সংস্কৃতির অনুশীলন করে না। আমরা যা করছি, তা সাংস্কৃতিক দাসত্ব এ কথা ব্যাখ্যা করে বলার দরকার পড়ে না।

আধুনিকতার অর্থ যদি হয় মুখকে মুখোশে পরিণত করা, আপন কালচার সংস্কৃতি, নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধকে ত্যাগ করে অন্যের কালচার সংস্কৃতি, নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধকে গ্রহণ করা, মায়ের কোল ছেড়ে ডাইনির কোলে মাথা রাখা, তাহলে ধিক এই আধুনিকতাকে। যে আধুনিকতা আমার মূল শিঁকড় উপড়াতে চায়, সে আধুনিকতাকে আমি ভয় করি। আমার বড় বোনকে বুবু সম্বোধনে যে পরিতৃপ্তি পাই, 'আপুতে' তা পাই না বরং হাঁপিয়ে উঠি। আম্মা-আব্বা সম্বোধনে অন্তরে যে স্নেহ-শ্রদ্ধা ও মায়া-মমতার ঢেউ ওঠে, তা হারিয়ে যায় মাম্মি-ড্যাডির ঝড়ো হাওয়ায়। আমার চাচি, মামি, খালা, ফুফু, আমার কত আপন। আমি কি পারি বিদেশী ভাষার সম্বোধন দ্বারা আমার আবহমান কালের সম্বোধনে কালিমা লেপন করতে? আমি কি পারি আমার চাচি, ফুফু, মামির সঙ্গে ঐতিহ্যের সম্পর্ক ছিন্ন করতে? সম্বোধনের ভাষা মধুর থেকে মধুরতর করলে অথবা পশ্চিমা

www.pathagar.com

কৃষ্টি-সংস্কৃতির অনুসরণ করে সম্বোধনে পরিবর্তন আনলে সম্পর্ক মধুর ও অন্তরঙ্গ হয় না। অন্তরে, মগজে ও চরিত্রে যদি থাকে পরকীয়া সংস্কৃতির মহব্বত, তাহলে সম্বোধনকে যত সুন্দর ও মধুর শব্দে রূপান্তর ঘটানো হোক না কেন, তাতে না বাড়বে শ্রদ্ধা আর না বাড়বে মধুরতা।

একটা উদাহরণ দিচ্ছি, ভেবে দেখা যেতে পারে। আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি আর সেবা-যত্নের সাহায্যে দাঁতের রোগ থেকে নিরাময় হওয়া যায়, দাঁতকে ব্যাধিমুক্ত ও সুন্দর রাখা যায়। চিকিৎসা ও সেবাযত্নই মুখ্য। কিন্তু আধুনিকতার কদর্থ করে যদি নিজের অরিজিন দাঁতকে উৎপাটন করে পাথরের কৃত্রিম সুন্দর দাঁত স্থাপনের ব্যবস্থা কেউ করেন, তাহলে পাথরের সাজানো সুন্দর দাঁত মুখে লাগিয়ে প্রদর্শন কাজটা শুধু চালাতে পারেন, কিন্তু অরিজিন দাঁতের উপকার থেকে চিরদিন বঞ্চিত থাকবেন। শুধু তাই নয়, এই ভুল আধুনিকতার বিরূপ প্রতিক্রিয়া সারা অঙ্গে ছড়িয়ে পড়তে পারে, এমনকি মৃত্যুও ডেকে আনতে পারে।

আধুনিকতার মধ্যে যা আছে ভাল, তা আমরা গ্রহণ করবো, ব্যবহার করবো, এ দ্বারা উপকৃত হবো, আধুনিকতা কারো বাপের বা কোন জাতি-গোষ্ঠীর বা দেশের মৌরসি সম্পত্তি নয়। সূর্য ও চন্দ্র সকলের জন্য উদয় হয়। তবে আধুনিকতার ভাইরাস বলতে যা কিছু আছে, তা সর্বনাশা, এ থেকে আমাদের শুধু দূরে থাকলেই চলবে না, এর প্রতিরোধে ও নির্মূলে সংগ্রাম করতে হবে। যদি প্রতিরোধ ও দমনে আমরা সক্ষম হই, তাহলে আধুনিকতা ভাইরাস মুক্ত হবে, নিরাময় হয়ে উঠবে এবং প্রত্যেকের ব্যবহার উপযোগী হবে।

খাবার আইটেমে মিষ্টি বৃদ্ধি করার জন্য গুড় ঢালতে পারেন, কিন্তু পরিমাণ মত, যা দরকার তাই, অতিরিক্ত কিছুই ভাল নয়। অতিরিক্ত যা ঢালা হবে তা অপচয় হবে, এই পরিমাণ ও পরিমাপ-জ্ঞান না থাকার কারণে পশ্চিমা গুড় দেখলে আমাদের অনেকের হুঁশে হুঁশ থাকে না। এ জন্য সম্বোধনেও পরকীয়া প্রভাব অত্যধিক। এ কারণে স্বকীয় শিঁকড় খ্রিস্টান ও পৌত্তলিক পোকায় আক্রান্ত।

www.pathagar.com

পলিটিক্স

যে যত বড় মাপের পলিটিশিয়ান, যার যত বেশি পাবলিসিটি, তার তত বেশি পরিচিতি, সম্পদ আর সুযোগ-সুবিধার দিক দিয়ে তিনি তত সমৃদ্ধ। একবার পলিটিক্স জমাতে পারলে তা দিয়ে আমৃত্যু রাজার হালে থাকা যায়; কখনো কখনো মামলা-মোকদ্দমা ও গ্রেফতারি পারোয়ানার ভয় থাকে, তবে আগাম জামিনের পথও খোলা চব্বিশ ঘণ্টা। পলিটিক্স ব্যবসার সবচেয়ে বড় পুঁজি 'মেহনত', ব্যক্তিত্বের ক্যারিশমা আর ফরেন লাইন। এই তিন-এর লাইন ও সাফল্য যার আছে, তার সবই আছে। পীরের 'বুজুর্গী' মরলেও যায় না, কেউ না কেউ গদীনসীন হয়ে মরহুমের প্রকল্প চালু রাখেন। জ্বীন যে বশ করে, সে নাকি অনেক কিছু সিদ্ধি লাভ করতে পারে। সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত করতে পারে ভৌতিক খেলা দেখিয়ে, যেমন ম্যাজিসিয়ানরা ম্যাজিক দেখিয়ে মানুষকে সম্মোহিত করে। পলিটিক্সকে যারা বশ করে পলিটিশিয়ান হয়েছেন, ধরে নিতে হবে, জাগতিক সকল সমস্যার তিনি সমাধান পেয়ে গেছেন, তবে নিরাপত্তার ব্যাপারটা থাকে নাজুক। প্রচন্ড রকমের সাবধানতা অবলম্বন করতে হয় বটে।

www.pathagar.com

পলিটিক্স আর রাজনীতি, প্রথমটি ইংরেজি এবং দ্বিতীয়টি বাংলা। আমি এখানে যে ভাব-ব্যঞ্জনা প্রকাশের জন্য চিন্তা করে রেখেছি, তা পলিটিক্স কেন্দ্রিক, রাজনীতি কেন্দ্রিক নয়। আমার ধারণা, রাজনীতিতে কূটনীতি তেমন নেই, কিন্তু পলিটিক্সে কূটনীতি ঠাসা। তাই 'পলিটিক্স'ই আলোচনার জন্য বেছে নিলাম।

'পলিটিক্স' শব্দটির রূপ-রঙ-গন্ধ আর আকার-আকৃতি ও -এর স্বাস্থ্যগত অবস্থা কেমন, তা আমি বিশেষ জানি না। যারা পলিটিক্স করেন, তারাও কতটুকু জানেন, তাও আমি জানি না। জানা-না জানার কোন তোয়াক্কা না করে প্রত্যেকে আপনা আপনা লাইনে ও স্টাইলে পলিটিক্স চালিয়ে যাচ্ছেন। পলিটিক্স হয়ে গেছে সব কিছুর লবণ। এ লবণ ভর্তা-ভাজিতে তো আছেই, মাছ গোশতের তরকারিতেও এমনকি ফিরনি-সেমাই-পায়েশেও নাকি মিষ্টি বৃদ্ধির জন্য দু'চার ছিটা লবণ দেয়া হয় । পলিটিক্সও আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অত্যাবশ্যকীয় লবণে পরিণত হয়েছে। ব্যাকরণে 'পলিটিক্স' বিশেষ্য পদ বাচ্য। কর্তার স্থানে তার অবস্থান। তাই মর্যাদাশীল শব্দ। বিদেশী শব্দ, তাও আবার ইংরেজি। ইংরেজি হলেই অভিজাত। নীল লহু ঢেউ খেলে।

'পলিটিক্স' শব্দটি উচ্চারণ করলে কেমন যেন 'অভিজাত অভিজাত' পুলক অনুভব হয়। পলিটিক্স শব্দের মধ্যে শান-শওকত ও বড়লোকি একটা আমেজ ও মেজাজ রয়েছে বলে মনে হয়। রাষ্ট্র নিয়ে তার কারবার। রাষ্ট্রের মানুষ এর কদরদানি করে। পলিটিক্যাল পার্টি হচ্ছে পলিটিক্সের এজেন্ট, নেতারা হচ্ছেন এর আড়তদার। পলিটিক্সের মেজাজ, আবেগ আর চরিত্রের মধ্যে নেতানেত্রীরা লীন হয়ে পলিটিশিয়ান হয়েছেন। এ কালের অনেক পলিটিশিয়ান পলিটিক্সের চাষ করে নিজেদের অন্ন-বস্ত্র এ থেকে সংগ্রহ করেন। ভোগ-বিলাসিতার যাবতীয় রসদ আর গাড়ি-বাড়ি করার অর্থ আর ব্যাংক ব্যালান্স করার মত মোটা তাজা অংকও পলিটিক্স চাষাবাদ থেকে আসে।

যে যত বড় মাপের পলিটিশিয়ান, যার যত বেশি পাবলিসিটি, তার তত বেশি পরিচিতি, সম্পদ আর সুযোগ-সুবিধার দিক দিয়ে তিনি তত সমৃদ্ধ। একবার পলিটিক্স জমাতে পারলে তা দিয়ে আমৃত্যু রাজার হালে থাকা যায়। কখনো কখনো মামলা-মোকদ্দমা ও গ্রেফতারি পারোয়ানার ভয় থাকে, তবে আগাম জামিনের

www.pathagar.com

পথও খোলা চব্বিশ ঘণ্টা। পলিটিক্স ব্যবসার সবচেয়ে বড় পুঁজি 'মেহনত', ব্যক্তিত্বের ক্যারিশমা আর ফরেন লাইন। এই তিন-এর লাইন ও সাফল্য যার আছে তার সবই আছে। পীরের 'বুজুর্গী' মরলেও যায় না, কেউ না কেউ গদীনসীন হয়ে মরহুমের প্রকল্প চালু রাখেন। জ্বীন যে বশ করে, সে নাকি অনেক কিছু সিদ্ধি লাভ করতে পারে। সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত করতে পারে ভৌতিক খেলা দেখিয়ে, যেমন ম্যাজিসিয়ানরা ম্যাজিক দেখিয়ে মানুষকে সম্মোহিত করে। পলিটিক্সকে যারা বশ করে পলিটিশিয়ান হয়েছেন, ধরে নিতে হবে, জাগতিক সকল সমস্যার তিনি সমাধান পেয়ে গেছেন, তবে নিরাপত্তার ব্যাপারটা থাকে নাজুক। প্রচন্ড রকমের সাবধানতা অবলম্বন করতে হয় বটে।

Politic (সুকৌশলী) কূটকৌশলপূর্ণ। কিন্তু এই পলিটিক্সের বানান Politick হওয়ার কারণে অর্থাৎ এই বানানে রূপান্তর ঘটার ফলে অর্থ হয়ে গেছে 'রাজনৈতিক কাজে লিপ্ত হওয়া'। এই কামলা খাটতে সেকালের রাজনীতিবিদরা রাজি হননি। তাদের আত্মসম্মানে বাধে। তারা মনে করলেন, এ হচ্ছে তাদের জন্য অপমানকর। তাই Politic থেকে Polytick, তারপর Politico করা হলো, কিন্তু লাভ হলো না। এতেও অপমানের বহু অনুকণা থেকে যায়। Politico-এর অর্থ নিন্দার্থে করা হয় 'রাজনৈতিক কাজে লিপ্ত ব্যক্তি'। অপমানজনক শব্দ ও অপমানজনক অর্থ। সেকালের পলিটিশিয়ানরা হয়তো Trick-এর আগে Poly যোগ করেও দেখলেন, শব্দটা পাতে দেয়া যায় কিনা। দু'টি অংশকে এক করে Polytick তৈরি করে দেখা হলো, তা বাজারে চলে কিনা। না, তাও চললো না। শব্দটির অর্থ দাঁড়ালো 'বহু প্রতারণার পূর্ব কৌশল'। কেমন যেন বেখাপ্পা ঠেকলো। তাই এটাও বাদ গেল। tic, tick, tico, trick যুক্ত কোন শব্দই যুৎসই নয়, কোনটাতেই ডিগনিটি থাকে না। অবশেষে politics-এ রূপান্তর ঘটিয়ে রাজনীতিকে শব্দটির মধ্যে ফিট করে একটা পরিতৃপ্তি পাওয়া গেল। এই politics-ই পলিটিশিয়ান বানাচ্ছে শত শত বছর থেকে।

এই পলিটিক্স গ্রীস শব্দ polis (নগর) ইংরেজি ভাষার পোশাক পলিটিক্স (politics) অঙ্গে ধারণ করে ইউরোপের শিল্প বিপ্লব থেকে রসাস্বাদন করে গীর্জা ও পাদ্রীদের আঁড় চোখে দেখে গীর্জা ও পাদ্রীদের বিরোধী মহলের পাশে এসে দাঁড়ায়।

www.pathagar.com

'পলিটিক্স' তখন নগর জীবনে একটা ঠাঁই করে নেয় এবং মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়। দেহাতি জীবনকে পাত্তা দেয়া হয়নি, তবুও পলিটিশিয়ানরা নিজ গরজেই দেহাতি সর্দারদের জাগিয়ে তোলার একটা প্রোগ্রাম রাখেন। পলিটিক্স সে সময় থেকে অভিজাত মহলে বিশেষ মর্যাদার সঙ্গে আদৃত হতে থাকে আর এর সুবাদে ক্ষমতার আসনে উঠবস শুরু করে দেয়, তখন পলিটিক্স নিয়ে তাত্ত্বিকেরা ব্যাকরণ রচনায় প্রবৃত্ত হন। তারা ব্যাকরণ তৈরিতে মনোযোগী হয়ে পড়েন। এ পর্যায়ে সৃষ্টি হয় দু'টি শ্রেণী, ১. রাষ্ট্রবিজ্ঞানী (যারা রাজনীতির ওপর গবেষণায় ব্যস্ত থাকতেন); ২. অন্য শ্রেণীটি হলেন রাজনীতিবিদ। এই দু'শ্রেণীর মধ্যে কোন্ শ্রেণীটি বড়, এ নিয়েও বিতর্ক শুরু হয়। এ বিতর্ক আজও আছে। এ পর্যায়ে পলিটিক্স হয়ে গেল ১. থিওরিটিক্যাল রাজনীতি আর ২. এপ্লাইড রাজনীতি। পলিটিশিয়ানরা ব্যবহারিক রাজনীতি নিয়েই আছেন আর তাত্ত্বিক রাজনীতিবিদরা রাজনীতির তত্ত্ব ও দর্শন নিয়েই আছেন। রাজনীতির তাত্ত্বিকেরা বললেন, রাজনীতি নিয়ে হৈ চৈ আর হৈ-হুল্লোড় করলে চলবে না, ব্যাকরণ বিধিমালায় আসতে হবে। কারণ, রাজনীতি যদি হয় দেশ ও জাতির মঙ্গলের জন্য, তাহলে রাজনীতি করতে হবে নিয়মের অধীনে। বলাবাহুল্য, রাজনীতি এখন সে অবস্থায় আছে, তাত্ত্বিকদের বিধি মেনেই চলছে, তবে সব দেশে একই বিধান কার্যকর নয়। তাত্ত্বিকেরাও তো নানা শ্রেণীতে বিভক্ত।

'পলিটিক্স' শব্দটির দৈহিক অবস্থা কেমন? এ প্রশ্নের উত্তর এক কথায় দেয়া সম্ভব নয়। কারণ হচ্ছে এই, এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে কয়েকটি প্রশ্নের চাবি দিয়ে তালাটি খুলতে হবে। পলিটিক্সের কোন চৌহদ্দি নেই, অবস্থানও নির্দিষ্ট নেই। প্রশ্ন করেই জানতে হবে, কোন্ দেশের পলিটিক্সের স্বাস্থ্য জানতে চান? উন্নত দেশের, না উন্নয়নশীল দেশের, না অনুন্নত দেশের? এ সব প্রশ্নের উত্তর জানলেও সঠিক জানা হবে না। আরও অনেক কিছু জানতে হবে। জানতে হবে কোন্ জাতের, কোন্ মেজাজের আর কোন্ প্রকৃতির পলিটিক্স সম্পর্কে জানতে চান। বিশ্বের সব দেশের পলিটিক্স যদি একই হতো, তাহলে বিভিন্নতার আর অনৈক্যের কাঁটাবন সৃষ্টি হতো না।

www.pathagar.com

কেউ কেউ বলবেন, পলিটিক্স তো পলিটিক্স, এর আবার জাত বিচার কি? না, প্রশ্ন হলো না, জাত বিচার আছে। গোটা দুনিয়ায় এক পলিটিক্স চলে না, চলছেও না। একটা সাধারণ উদাহরণ দিয়ে যদি বুঝি, তাহলে সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে। বাংলাদেশ তো আমাদের দেশ। ফল-ফসল সব জেলাতেই কম-বেশি হয়। কিন্তু যশোহরের পেঁপে বরিশালে পাবেন না। বরিশালের আমড়া পাবেন না যশোহরে। সিলেট আর চেরাপুঞ্জির কমলা ফরিদপুরে জন্মে না, আর ফরিদপুরের খেঁজুরের রস সিলেটে পাবেন না। রাজশাহীর আম রাজশাহীতে হয়, এ আম মানিকগঞ্জে উৎপন্ন হলেও সেই মজা আর স্বাদ পাওয়া যায় না। এদিকে মানিকগঞ্জের ঝিটকার হাজারী গুড় বাংলাদেশের কোথাও তৈরী হয় না। পলিটিক্সেরও জাত বিচার আছে, স্থান, কাল, বিচার আছে। মানুষ তো সবই, সব মানুষের স্রষ্টাও একজন, তবুও কেন বর্ণের উচ্চতার, ভাষার, মেজাজের ও চরিত্রের এত বিভিন্নতা? এ জন্যই বলছি, পলিটিক্সে মোটাতাজা, হালকা যেমন আছে, চরিত্রেও আছে স্থানকাল পাত্র ভেদে নানা ভিন্নতা।

যেমন পলিটিক্সটা যদি হয় সমাজতান্ত্রিক পলিটিক্স, তাহলে তাকি কল্পনা বিলাসী বা উটোপিয়ান সমাজতান্ত্রিক পলিটিক্স? তাকি গণতান্ত্রিক, সমাজতন্ত্রবাদী পলিটিক্স বা ফোবিয়ান সোজালিজম পলিটিক্স? একি খ্রিস্টীয় সমাজতন্ত্রবাদ পলিটিক্স, নাকি সিন্ডিক্যালিজম পলিটিক্স? নাকি তা গিল্ড সোশালিজম পলিটিক্স? নাকি স্টেট সমাজতান্ত্রিক অর্থাৎ রাষ্ট্রায়ত্ত সমাজতান্ত্রিক পলিটিক্স, নাকি বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ বা মার্কসীয় সমাজতন্ত্রবাদী পলিটিক্স? নাকি নিরেট সাম্যবাদী পলিটিক্স, না চীন অথবা রাশিয়ান কমিউনিজমের পলিটিক্স? না ফ্যাসিবাদী সমাজতান্ত্রিক পলিটিক্স? এবার বুঝুন, পলিটিক্সের ঠ্যালটা। এখনও আমি সমাজতান্ত্রিক বলয় থেকে বের হতে পারিনি। পলিটিক্স সমাজতান্ত্রিক বলয়ে ঘুরপাক খেয়ে কি পরিমাণ ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে, তা বর্ণনা করা কঠিন। আজকাল কিন্তু সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় অন্য ধরনের পলিটিক্স চলছে বলে রক্ষা, নতুবা পলিটিক্সের দফারফা হতো।

মুক্ত দুনিয়ার পলিটিক্সও হরেক কিসিম। এ পলিটিক্স স্বৈরতান্ত্রিক না রাজতন্ত্র, সামরিকতন্ত্র না একনায়কতন্ত্র, গণতান্ত্রিক, না আমলাতান্ত্রিক, লিমিটেড মনার্কি, না প্রজাতন্ত্র, ইউনিটারী না ফেডারেল, পার্লামেন্টারী না প্রেসিডেন্সিয়াল,

www.pathagar.com

অভিজাততান্ত্রিক না সাম্রাজ্যবাদী, মেকিয়াভেলী না হাফ সামরিক, হাফ-গণতান্ত্রিক না নিয়ন্ত্রিত গণতান্ত্রিক, না গণতান্ত্রিক লেবাসে সন্ত্রাসী, না সন্ত্রাসী লেবাসে গণতান্ত্রিক পলিটিক্স? এ সবের পরিচয় ও পরিচিতি না জানলে অর্থাৎ পলিটিক্সের মেজাজ, প্রকৃতি, স্থান-কাল ও সাইজের ব্যবহার-নীতি না জানলে প্যাথলজিক্যাল টেস্টে দেয়া যাবে না। প্যাথলজিক্যাল টেস্ট ছাড়া পলিটিক্সের তবিয়ত কেমন তা জানাও যাবে না।

নাদুস-নুদুস, মেদবহুল, মেদহীন, সুঠামদেহী, স্বাস্থ্যবান, কংকালদেহী, জরাগ্রস্ত, অলস, জন্ডিস, পাহলোয়ান, খাটো, লম্বা, মধ্যম ইত্যাদি সব মেজাজের সব অবস্থার পলিটিক্স এ দুনিয়াতে আছে। পলিটিক্স যখন কাউকে অনুসরণ করে বা কারো ওপর ভর করে তখন সিন্দাবাদের দৈত্যের মত গর্দানে স্থায়ীভাবে বসে যায়, আর সরানো যায় না। তবে পলিটিক্সের লেজ ধরে যারা পলিটিশিয়ান হতে চান, পলিটিক্স তাদেরও লুফে নেয়। পলিটিক্স এক প্রকার নেশার নাম। যে দেশে পলিটিক্স কমবেশি আছে, সে দেশের প্রত্যেক মানুষ কম-বেশি পলিটিক্স আক্রান্ত। লেখাপড়া না জানা কাজের বুয়াদের যখন আপনি মিছিলে দেখেন, তখন কি মনে হয় না যে পলিটিক্সের হাওয়া তাদের গায়ে লেগেছে? পলিটিক্স এমন এক বন্ধন, যে বন্ধনের বাধন থেকে কেউ মুক্ত নন।

পলিটিক্স করে পলিটিশিয়ান হতে পারেন দেশের একটি শ্রেণী মাত্র। এই শ্রেণীও নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণীর পলিটিশিয়ান, দ্বিতীয় শ্রেণীর পলিটিশিয়ান, তৃতীয় শ্রেণীর পলিটিশিয়ান, এভাবে নানা শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথম, দ্বিতীয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তৃতীয় শ্রেণীর পলিটিশিয়ানরা পলিটিক্সের ময়দানে মাতবরী করেন আর অন্যান্য শ্রেণীর পলিটিশিয়ানরা পলিটিক্সের কর্মীদের নিয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পলিটিশিয়ানদের হুকুম পালন করেন, খেদমত করেন, চেয়ার-টেবিল টানাটানি করেন, ব্যানার নিয়ে মিছিলে যান, কর্মীদের জড়ো করেন, মিছিলে জিন্দাবাদ, মুর্দাবাদ আওয়াজ তোলেন, তারাই বিরোধী দলের আর পুলিশের হামলার শিকার হন।

ক্ষমতার পলিটিক্স যারা করেন, তারা পলিটিশিয়ান বটে, কিন্তু কোন মহৎ লক্ষ্য-আদর্শ তাদের থাকে না। লক্ষ্য বলতে একটি মাত্র লক্ষ্য তাদের থাকে, তা

www.pathagar.com

হচ্ছে কিভাবে ক্ষমতায় যাওয়া যায়। ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য যা করা সম্ভব, তাই তারা করেন। ঘন ঘন কর্মসূচি বদলান, সনাতনী আদর্শের নামও মুখে উচ্চারণ করেন। এই পলিটিক্স তাদের নেশা ও পেশা হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের দেশের এক নেত্রী একবার সরকারি একটি ফরম পূরণ করতে গিয়ে 'পেশা'র ডানে লেখেন 'রাজনীতি'। এর মানে রাজনীতিই তার জীবন-জীবিকার অবলম্বন। ক্ষমতার রাজনীতি যারা করেন, তারাই এমন লিখতে পারেন। এই শ্রেণীর পলিটিশিয়ানের কাছে পলিটিক্স শুধু পেশা নয়, ব্যবসাও। পেশা আর ব্যবসার এমন সমন্বয় আর কোন ক্ষেত্রে আছে বলে আমার জানা নেই। ক্ষমতার রাজনীতি যারা করেন, তারা পলিটিক্সকে পেশা আর ব্যবসা হিসেবেই গ্রহণ করে সন্তুষ্ট থাকেন তাই নয়, ক্ষমতায় যেতে পারলে ঘুষটা হয়ে যায় মুখ্য। ক্ষমতাপাগল পলিটিশিয়ানরা এমনভাবে পলিটিক্সকে পলিউট করেছেন যে, পলিটিক্স শব্দের আভিজাত্য, মর্যাদা ও মান-ইজ্জত অনেকাংশে ভুলুণ্ঠিত হয়েছে অন্তত আমাদের সমাজে। এখন পলিটিক্স শব্দটা সুশীল সমাজ বরদাশত করতে পারেন না। এ শব্দ শুনলে নাসিকা কুঞ্চন করেন, কপালের চামড়ায় কয়েকটা ভাজ পড়ে। চেহারা মলিন করে মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে রাখেন। দোষ কি পলিটিক্সের? না, পলিটিক্স শব্দের দোষ নেই, পলিটিক্সকে যারা পলিউট করেছে, দোষ তাদের। কারণ, পলিটিক্সে তারা যোগ করেছেন চোগলখুরী, গিবত, প্রতারণা, জালিয়াতী, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, কিলাকিলি, মারামারি, মিথ্যাবাদিতা, অপহরণ, ধর্ষণ, চরিত্র হনন, অপমান, অপদস্তকরণ, মস্তানী এমনকি খুনাখুনি। এ জন্য বর্তমানের পলিটিক্স আমাদের সমাজে পলিউটেড হয়ে ব্যবহৃত হচ্ছে। 'পলিটিক্স' কদর্থের একটি শব্দ হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে আ'মভাবে।

সমাজে এমন বাক্য প্রায়ই শোনা যায়, যেমন কোন একজন অন্যজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, অমুক লোকটা কেমনরে? এ প্রশ্নের উত্তর কখনো কখনো পাওয়া যায় এভাবে, আর বলো না, সে পুরোপুরি পলিটিশিয়ান। এর মানে লোকটা সুবিধাজনক নয়, প্যাঁচালো। এখানে পলিটিক্স হয়েছে পলিউটেড। যেমন দু'জনের মধ্যে কোন এক বিষয় নিয়ে কথা হচ্ছে। একজন কিন্তু অন্যজনের কথা ভালভাবে বুঝতে পারছেন না বা বুঝলেও কষ্টে বুঝছেন। তিনি চান অপর পক্ষ থেকে সহজ বক্তব্য। এ পর্যায়ে যিনি কষ্টে বুঝছেন তিনি তার মেজাজকে কিছুটা উত্তপ্ত করে অপরজনকে বললেন, পলিটিক্স ছাড়ুন, পলিটিক্সের কথা আমি কম বুঝি, পলিটিক্স

www.pathagar.com

করে কথা না বলে সোজাসুজি বক্তব্য রাখুন। এর মানে হচ্ছে, এখানে পলিটিক্স ঘুরালো-প্যাঁচালো ঝামেলার নাম। কূটিলতা, সাত চক্কর দিয়ে প্যাঁচ কষে কথা বলার নাম পলিটিক্স।

যদি এমন কথা শুনেন, যেমন বড় ভাই তার ছোট ভাইকে বলছেন, করিম সাহেবকে আমার সালাম দেবে। সমস্যাটা নিয়ে তার সঙ্গে আলাপ করা যাক। তিনি কি পরামর্শ দেন শুনি।

ছোট ভাই বলছে, ভাইজান, করিম সাহেবকে আপনি এখনও চিনতে পারেননি। তার প্রত্যেক কথায় থাকে পলিটিক্স। কি করতে এসে কি করে যাবেন, বলা যায় না। শেষে আম ও ছালা দু'ই যাবে।

এখানে ধুরন্ধর গোছের ধুরন্ধরী বুদ্ধির সঙ্গে পলিটিক্সকে তুলনা করা হয়েছে। পাকিস্তান আর ভারতের মধ্যে ক্রিকেট খেলা প্রায় বন্ধ ছিল। এ খেলা আবার যাতে শুরু হয় সে জন্য পাকিস্তান ভারতসহ বিশ্বের অনেক দেশের ক্রীড়াবোদ্ধারা যে যুক্তি ও ভাষায় দাবি জানান, তা হচ্ছে এই, খেলায় কেন পলিটিক্স, খেলা হোক পলিটিক্স মুক্ত, মুখ্য হোক বিনোদন। ১৫ বছর পর দু'দেশের মধ্যে খেলা আবার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এখানে পলিটিক্স এসেছে বিনোদনের প্রতিবন্ধক হিসেবে, ক্রিকেটের বাধা হিসেবে।

সামাজিক কোন সেবা সংগঠনের সভায় শুরুতেই সভার সভাপতিকে বলতে শোনা যায়, এ এক সামাজিক সেবা সংগঠন। পলিটিক্স মুক্ত সংগঠন। এর মধ্যে পলিটিক্স কেউ টেনে আনবেন না।

এখানে সভাপতি সাহেব পলিটিক্সকে সমাজসেবা কার্যক্রমের অন্তরায় মনে করেন। পলিটিক্স তাহলে এ ক্ষেত্রেও গ্রহণযোগ্যতা পায়নি।

শিক্ষাঙ্গনে তো রাজনীতি রীতিমত বিভীষিকা সৃষ্টি করেছে। এ কারণে কোন কোন স্কুল-কলেজের বিজ্ঞাপনে এবং প্রোসপেক্টাসে লিখে দেয়া হয়, এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোন পলিটিক্স নেই।

www.pathagar.com

রাজনীতি কি এতই খারাপ যে, সব দিক থেকে 'দূর দূর' শুরু হয়েছে? না, আসলে পলিটিক্স কোন খারাপ শব্দ নয় এবং রাজনীতি আসলে কারো কোন খারাপও করে না। রাজনীতির জন্মই হয়েছে দেশ ও জাতির কল্যাণের জন্য। কিন্তু রাজনীতি করা যাদের জন্য শোভা পায় না, তারা রাজনীতিকে জবরদখল করার কারণে এবং তাদের ব্যবহার দোষে রাজনীতি ঘাটে ঘাটে মার খাচ্ছে। যেমন 'সাম্যবাদ' শব্দটি একটি ভাল শব্দ, কিন্তু মতলববাজ কমিউনিস্টদের হাতে পড়ে 'সাম্যবাদ' একটি দূষিত শব্দে পরিণত হয়েছে। যে কারণে পূর্ব ইউরোপে ও সোভিয়েত রাশিয়া থেকে 'সাম্যবাদ' ঝাটার বাড়ি খেয়ে পালিয়েছে।

আমাদের দেশে পলিটিক্স যেভাবে পলিউটেড হয়েছে, পলিউশনের এই পলেস্তারা থেকে শব্দটিকে মুক্ত করতে পারেন তারা, যারা ব্যবহার দোষে শব্দটিকে দূষিত করেছেন। গত কয়েক বছর থেকে পলিউটেড পলিটিশিয়ানরা পলিটিক্সকে সন্ত্রাস ওরিয়েন্টেড করার কারণে পার্লামেন্টে পর্যন্ত পলিউটেডরা পলিটিশিয়ান হিসাবে প্রবেশের সুযোগ পেয়েছে।

পলিটিক্সের ওপর জনগণের আস্থা আবার ফিরিয়ে আনার জন্য ব্যবস্থাও আছে, যদি নির্বাচনে প্রার্থীদের নৈতিক চরিত্রকে মুখ্য বিবেচনায় আনা যায়। অর্থাৎ পলিটিক্সকে যদি হাজারী গজারীদের থেকে মুক্ত করা যায়, নির্বাচনে তাদের যদি প্রার্থী হওয়ার কোন সুযোগ দেয়া না হয়, তাহলে তারা পলিটিক্স বাদ দেবে নতুবা চরিত্র সংশোধন করে প্রার্থী হবে।

পলিটিক্স কোন সুস্বাদু ফল নয়, কিন্তু ক্ষমতা-পাগল পলিটিশিয়ানরা একে সুস্বাদু ফল মনে করে গিলে ফেলেন, জনগণ ছোবড়াও পায় না, যা পায় তা পলিউটেড পলিটিক্স পায়, তাই পলিটিক্সের গ্রহণযোগ্যতা দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। যদিও অপরিহার্য আপদ বা বোঝা হিসাবে কাঁধে সওয়ার হয়ে বসে আছে শক্তভাবে।

www.pathagar.com

'আমরা পিএইচডি করেছি বটে-

হ্যাঁ, পিএইচডি করা, এমনকি নোবেল পুরস্কার পাওয়ার মত গৌরব অর্জন করা অথবা জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল হওয়া, কোন দেশের প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী হওয়া অর্থাৎ কোন একটির ক্ষেত্রেও নৈতিক চরিত্রের সম্পৃক্ততা নেই। কোন ক্ষেত্রেরই পরীক্ষক বা নির্বাচকমণ্ডলী দেখেন না যে, প্রার্থীর নৈতিক জ্ঞান ও আমল কতটুকু। এ ব্যাপারে পাসের জন্য কোন নম্বরও রাখা হয় না। মোটকথা, জাগতিক জীবনে সাফল্য লাভের যোগ্যতা অর্জনের স্ট্যান্ডার্ড বা মাপকাঠি আর নীতি নৈতিকতার আদর্শে আদর্শবান হয়ে সমাজে, রাষ্ট্রে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে খ্যাতিমান হওয়ার যোগ্যতা অর্জন আজকাল ভিন্ন। দুয়ের মধ্যে কোন মিল নেই এবং মিল রাখাও হয় না। একটার সঙ্গে অন্যটার দূরতম কোন সম্পর্কও নেই।

www.pathagar.com

এই আলোচনার শিরোনামে যে কথা আছে, তা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর এমাজউদ্দিন আহমদের। তিনি এ কথা বলেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ৭৫ বছর পূর্তি এবং ঢাকা ইউনিভার্সিটি এলামনাই এসোসিয়েশনের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার শীর্ষক সেমিনারে। তারিখটি ছিল ১৯৯৫ সালের সম্ভবত ২রা নভেম্বর।

দীর্ঘদিন পর এ কথা কেন স্মরণ করলাম, এ প্রশ্ন কারো কারো মনে সৃষ্টি হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। অকারণে স্মরণ হয়নি। অনেক পুরানো ব্যাধি আছে যা অমাবস্যা-পূর্ণিমায় হামলা করে, অনুভব হয় ব্যাধির অস্তিত্বের। যেভাবে চতুর্দিকে সন্ত্রাসের বিস্তৃতি ঘটছে, একই দিনে ১০টি খুনের ঘটনার খবর পাঠ করে এই পুরান কথাই নতুন করে মনে পড়েছে।

শ্রদ্ধেয় ভাইস চ্যান্সেলর এই টাটকা ও খাঁটি কথা বলেছেন, কোন ভান-ভনিতা ছাড়া। এ কথা কাকে কতটুকু প্রভাবিত করেছে তা জানি না, তবে আমাকে এই স্পষ্ট কথা বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। এ প্রভাবের প্রকাশ বিলম্বে করছি, ত্রুটি শুধু এটাই। যা হোক, তাঁর এই স্পষ্ট ও সত্য সরল কথার ব্যাখ্যা আমার মতে প্রধানত তিনটি হতে পারে। একটি হচ্ছে এই (১) পিএইচডি করা একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। নিষ্ঠা, সাধনা, একাগ্রতা, মেধা এবং লক্ষ্য অনুযায়ী অনুশীলন থাকলে পিএইচডি করা যায়। পিএইচডি করার জন্য অন্য কোন ট্রেনিং বা কসরতের প্রয়োজন হয় না। পুলিশের দারোগা হতে হলেও বিশেষ ধরনের ট্রেনিং লাগে, অনেক রকম লিখিত ও প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা দিতে হয়, কিন্তু এর কোন কিছুই লাগে না পিএইচডি করতে। পিএইচডি করতে সন্ত্রাস দমনের প্রশিক্ষণ নিতে হয় না, চাঁদাবাজদের মুকাবিলা করার কায়দা-কানুন জানতে হয় না, শিষ্টাচার, সত্যবাদিতা, স্পষ্টবাদিতা, সত্য প্রকাশের সাহসিকতা, দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালনের প্র্যাকটিক্যাল বা থিওরিটিক্যাল পরীক্ষারও প্রয়োজন হয় না। পিএইচডির জন্য পরীক্ষার্থী মাত্র একজন, পরীক্ষক হয়তো একাধিক। তথ্য প্রমাণ, উপস্থাপন, বিশ্লেষণ এবং বিষয়ভিত্তিক রেফারেন্স আর ব্যাখ্যাই পিএইচডির জন্য দরকার।

www.pathagar.com

'পিএইচডি করেছি বটে, কিন্তু সন্ত্রাস দমনের কোন শিক্ষা পাইনি' এ কথার আর একটি অর্থ হতে পারে এই, (২) তথ্যগত ও তাত্ত্বিক জ্ঞানই তথ্য ও তত্ত্বানুসন্ধানী বা শিক্ষার্থীর জন্য প্রয়োজন। পিএইচডিধারীরা তাদের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য সহায়তা করতে পারেন, কিন্তু এ জ্ঞান ও শিক্ষা দ্বারা শিক্ষাক্ষেত্রের সন্ত্রাসী ও শিক্ষা দুশমনদের হেদায়েত করা যায় না। এদের জন্য থানা পুলিশই উপযুক্ত ব্যবস্থা। শিক্ষাঙ্গনে যা করে রাখা হয়েছে তা দূর করা শিক্ষকদের কাজ নয়, এর প্রতিষেধকও তাদের জানা নেই, এ প্রশিক্ষণও তারা নেননি। সুতরাং শিক্ষকদের থেকে জ্ঞান ছাড়া অন্য কিছুর প্রত্যাশা করা ঠিক নয়।

(৩) তৃতীয় ব্যাখ্যা হচ্ছে এই, গোটা শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিক জ্ঞান অর্জন, নৈতিক চরিত্র গঠন, অনৈতিক জীবনাচরণে গড়ে ওঠা চরিত্রের সংশোধন, ওহিভিত্তিক ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী ব্যক্তি, সমাজ, জাতি ও রাষ্ট্র গঠনের জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ দানের কোন ব্যবস্থা নেই। ধর্মীয় ও নৈতিক জ্ঞান দান ছাড়া সাধারণভাবে সব জ্ঞান দানই করা হয়। প্রদত্ত এসব জ্ঞানে জ্ঞানপ্রাপ্তরা যা হবার তাই হয়। এদের মধ্যেও আল্লাহ পাক যাদের হেফাজত করে রাখেন তারা সৌভাগ্যবান। এই সৌভাগ্যবানরা বড় বড় পদে অধিষ্ঠিত হয়ে আবিলতামুক্ত সমাজ গড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারেন বটে এবং ইচ্ছা প্রকাশ করেনও, কিন্তু ইচ্ছার বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না। এর প্রধান কারণ, তাদের নেক ইচ্ছা আছে বটে, কিন্তু তাদের নেই সেই ইলিম তালিম কিছুই। নেক ইচ্ছা নিয়ে নিজেরা সংরক্ষিত চরিত্রের মানুষ হওয়া সত্ত্বেও এ কারণে সমাজে প্রবহমান সর্বনাশা ঝড়ের মুকাবিলা করতে পারেন না। এই ব্যর্থতা প্রকাশ করতে গিয়ে মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর বা অন্য কেউ যদি বলেন যে, আমরা পিএইচডি করেছি বটে কিন্তু সন্ত্রাস দমনের কোন শিক্ষা পাইনি, তাহলে এ কথা স্বীকার করে নিতে হবে যে, অত্যন্ত সঠিক উচ্চারণ, সঠিক তথ্যের উদঘাটন এবং সত্যের প্রকাশই তারা ঘটিয়েছেন। যদিও তাতে ব্যর্থতার অনুরণন আছে এবং তা বাস্তব।

হ্যাঁ, পিএইচডি করা, এমনকি নোবেল পুরস্কার পাওয়ার মত গৌরব অর্জন করা অথবা জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল হওয়া, কোন দেশের প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী হওয়া অর্থাৎ কোন একটির ক্ষেত্রেও নৈতিক চরিত্রের সম্পৃক্ততা নেই।

www.pathagar.com

কোন ক্ষেত্রেরই পরীক্ষক বা নির্বাচকমণ্ডলী দেখেন না যে প্রার্থীর নৈতিক জ্ঞান ও আমল কতটুকু। এ ব্যাপারে পাসের জন্য কোন নম্বরও রাখা হয় না। মোটকথা জাগতিক জীবনে সাফল্য লাভের যোগ্যতা অর্জনের স্ট্যান্ডার্ড বা মাপকাঠি আর নীতি নৈতিকতার আদর্শে আদর্শবান হয়ে সমাজে, রাষ্ট্রে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে খ্যাতিমান হওয়ার যোগ্যতা অর্জন আজকাল ভিন্ন। দুয়ের মধ্যে কোন মিল নেই এবং মিল রাখাও হয় না। একটার সঙ্গে অন্যটার দূরতম কোন সম্পর্কও নেই। সমাজ পরিচালক ও রাষ্ট্র পরিচালক বলে যারা খ্যাত, তারা গীর্জা আর স্টেট আলাদা এই পলিসি মেনে চলেন। তারা এই জগতে খ্যাতিমান হওয়ার ভিত্তি নৈতিকতা থেকে শত যোজন দূরে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে, প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত যে সব বিষয় ও বিষয়ভিত্তিক বই পড়ানো হয়, পড়া হয়, সে সব বইয়ের কোন রচয়িতার জীবন সর্বোচ্চ নৈতিক মানের নয়। তারা জীবন ও জগতকে নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন না, দেখেন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। সুতরাং তারা এই দৃষ্টিভঙ্গি আর চরিত্রের মানুষ হওয়ার কারণে তাদের রচিত বই-পুস্তকের চরিত্র বৈশিষ্ট্য তাই হয়ে থাকে। এদের রচিত বই-পুস্তকে আল্লাহ রাসূলের কথা পরোক্ষভাবেও আসে না। নীতি নৈতিকতা দ্বীন ধর্মের হাওয়া-বাতাস পায় না তাদের রচনা। ডারউইন প্রসঙ্গ আসলে ডারউইনকে মহামানবের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা হয়, তার বানর মতবাদকে উচ্চে তুলে ধরা হয়, এসবকে খণ্ডনের প্রয়োজন কেউ বোধ করলেও ডারউইনের আমলের কোন কোন প্রতিদ্বন্দ্বীর সমালোচনা সংক্ষিপ্ত আকারে আনা হয়, কিন্তু মানব সৃষ্টির ধারাবাহিকতা যা কুরআন-হাদীসে রয়েছে তা দক্ষতার সাথে বিজ্ঞান সম্মতভাবে পেশ করা হয় না। রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের কথা তাদের রচিত পুস্তকে আলোচনা করা হলে রাজ্যের প্যাঁচাল পাড়া হয়, কিন্তু সব ধরনের তথা সকল সার্বভৌমত্বের মালিক যে একমাত্র রাব্বুল আলামিন আল্লাহ পাক, তা সংজ্ঞায় বা ব্যাখ্যায় আসে না, আসলেও এমনভাবে আসে যা পাঠ করলে শিক্ষার্থীর মনে কোন রেখাপাত করে না। এভাবে যত বই-পুস্তক আর রচনা আসছে সবই এক ধাঁচের এক মানসিকতার, এক দৃষ্টিভঙ্গির তথা সেক্যুলার চিন্তাধারায় মণ্ডিত হয়ে। ফলে এ সব বই পড়ে যারা পাস করে কর্মক্ষেত্রে আসেন তাদের নৈতিক চরিত্র তেমনই হয়।

www.pathagar.com

স্কুল পর্যায়ে সাত পিরিয়ডের মধ্যে একটি পিরিয়ড থাকে দ্বীনিয়াত ক্লাসের বা ধর্ম ক্লাস। একজন মৌলভী স্যার আসেন। শিক্ষার্থীরা সে সময় মাথায় টুপি দেয়। মৌলভী স্যার শিক্ষা দেন, শিক্ষার্থীরা শিক্ষা নেয়, ক্লাস শেষ হয়। মাথার টুপি পকেটে ঢুকে। আবার সাবেক অবস্থা, সাবেক মানসিকতা। মোটামুটিভাবে এই হলো আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার চিত্র। এ চিত্র কিন্তু পূর্ণাঙ্গ চরিত্রের এক ছায়াদৃশ্য মাত্র। এই শিক্ষা নিয়ে বা শিক্ষা পেয়ে যারা কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, তাদের থেকে তাই পাওয়ার আশা করা যেতে পারে, যা তারা অর্জন করেছেন। এর অধিক আশা করা যায় না। তবে যারা এই শিক্ষা পেয়েও শিঁকড়ের সঙ্গে এখনও যুক্ত, নৈতিকবোধ তাদের মধ্যে জাগ্রত, তাদের সংখ্যা নগণ্য। এই নগণ্য সংখ্যকের কতিপয় সম্মানজনক ব্যতিক্রম ছাড়াই সবাই নির্জীব অবস্থায় ভদ্রজীবন যাপন করেন। সমাজে তাদের অবস্থান আছে বটে, কিন্তু নিষ্ক্রিয়, নিজেদের নিয়ে তারা খুবই ব্যস্ত। মহাব্যস্ত। নীতি-নৈতিকতার দু'চারটা তাত্ত্বিক কথা মাঝে মাঝে তারা ছাড়েন, আর এভাবে দিন যাপন করে মনে করেন এর অধিক তাদের কিছু করার নেই। মধ্যযুগকে যারা গালি দেয়, তাদের মধ্যে যারা লেখাপড়া জানা লোক হয়েও মূর্খ, ওদের কথা বাদই দিলাম, যারা সেয়ানা, শিক্ষিত এবং মধ্য যুগের ইতিহাস জানেন, তারা জেনেশুনেই মধ্যযুগকে বরদাশত করতে পারেন না। তারা জানেন, মধ্যযুগের মূল্যবোধ যদি আধুনিক যুগে ফিরে আসে, তাহলে বড়ই বিপদ। যিনি বিজ্ঞানী হবেন, ইতিহাসবেত্তা হবেন, সমাজ বিজ্ঞানী হবেন, তিনি উন্নত চরিত্রের মুসলমানও হবেন। ইলিম ও আমলের এই মিলন তাদের পছন্দনীয় নয়। মধ্যযুগের অনেক জ্ঞান তাপসের জীবনী পাঠ করলে জানা যায়, আল্লাহর এবাদতে তারা যেমন বিশেষভাবে আগ্রহী ছিলেন, তেমনি জাগতিক জ্ঞান সাধনায়ও ছিলেন নিবেদিত ও নিবিষ্ট। এই সমন্বয় আজকাল নেই। ব্যবধানের প্রাচীর নির্মিত হয়েছে। এক দিকের শীর্ষ জ্ঞানী ব্যক্তি অন্যদিকের প্রাথমিক জ্ঞানও রাখেন না। দু'পক্ষের ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর এমাজউদ্দিন আহমদের উক্তি 'আমরা পিএইচডি করেছি বটে কিন্তু সন্ত্রাস দমনের কোন শিক্ষা পাইনি' এ কথার মধ্যে বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতি আর অসারতা ও অসম্পূর্ণতাই যে বিধৃত, তা আর ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন পড়ে না। এমন একটা বাস্তব ও খাঁটি কথা আমরা শুনলাম বহুদিন পর। যদি তাঁর কথাকে আমরা খাঁটি কথা

www.pathagar.com

বলে গ্রহণ করে নেই, তাহলে তা বাস্তবায়নের দায়-দায়িত্বও নিশ্চয়ই আমাদের ওপর বর্তায়। আসুন না, সর্বস্তরের শিক্ষাকে আমরা নৈতিক মান ও উপকরণ দিয়ে গড়ে তুলি। যে শিক্ষায় থাকবে আধুনিক জ্ঞান, আল্লাহর এবাদতে আগ্রহ, দুষ্টের দমন ও সিষ্টের পালনে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের সাহসিক আন্তরিকতা তথা সন্ত্রাস দমনের শিক্ষা এবং নৈতিক মূল্যবোধে সমাজ গড়ার মানসিকতা চরিত্রে সুন্দর হওয়ার প্রতিযোগিতা।

মুসলিম পিএইচডিধারী প্রয়োজন হলে নামাজে জানাযার ইমামতি করতে পারবেন, জুমার নামাজের ইমামতিও করতে পারবেন, এমন পিএইচডি আছেন বটে, কিন্তু সংখ্যায় খুবই কম। অনেক পিএইচডিকে দেখেছি জিন্দা পীরকে সেজদা করতে। এমন একজন পিএইচডি'র সাক্ষাৎকার নিয়ে জানতে পারলাম, তিনি পিএইচডি বটে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতাও করেন, কিন্তু ইসলামের প্রাথমিক জ্ঞানও তার নেই। নামাজের সূরা ও দোয়া জানেন না। রিটায়ার্ড হওয়ার আগে আখেরাতের কথা মনে হয়েছে, তাই তিনি পীর ধরে আখেরাত পার হতে চান। কে নাকি তাকে এ পরামর্শ দিয়েছে, তাই তিনি পীর ধরেছেন।

জনাব এমাজউদ্দিন আহমদ এ ধরনের পিএইচডি নন, তাই এমন হক কথাকে বে-নেকাব হিম্মতের সাথে বলতে পারলেন 'আমরা পিএইচডি করেছি বটে, কিন্তু সন্ত্রাস দমনের শিক্ষা পাইনি।

www.pathagar.com

'মুসলমান হলে কী হবে মানুষটি কিন্তু ভাল'

মুসলমানদের এত বড় গালি দেয়ার পরও যে আপনি অনুরূপ গালি খাননি, এদ্বারাও কি প্রমাণিত হয় না যে, মুসলমানরা সহনশীলতার দিক দিয়ে আপনাদের চেয়ে কত উচ্চে? আপনি গালি দিলেন আর এ দেশের মুসলমানরা আপনাকে মাফ করে দিলো। এর চেয়ে ভালো মানুষী আর কি চান? আমি কি ভারতে গিয়ে হিন্দুদের এমন গালি দিয়ে প্রাণটা নিয়ে বাংলাদেশে ফিরে আসতে পারবো? তবে আমার কৃষ্টি-সংস্কৃতি আমাকে এমন গালি দিতে 'এলাও' করে না এবং এমন গালিও আমি দেবো না। আপনার দাঁড়িপাল্লায় আপনার ওজন, আমার দাঁড়িপাল্লায় আমার ওজন। পৃথিবীতে ৫৭টি দেশ মুসলমানরা শাসন করে। পৃথিবীর সব দেশে মুসলমানরা রয়েছে। আপনি ক'টি মুসলমানকে চেনেন? নামের শেষে 'গুণ' যোগ করলেই গুণী হওয়া যায় না। দ্বার বন্ধ করে যদি ভ্রমটাকে আগলিয়ে ধরে রাখেন, তাহলে সত্য প্রবেশ করবে কি ভেন্টিলেটার দিয়ে? ভেন্টিলেটারেও যে মাকড়শার জাল।

www.pathagar.com

'দীর্ঘ দিন পর হঠাৎই দেখা হয়ে গেল আমার এক বোনের সঙ্গে। পাঁপড়ি, ও ভালোবেসে বিয়ে করেছে নেভীর একজন সৈনিককে। নাম কমোডর আজিম। এ এফএম আজিম (টিএএস) পিএসসি। সম্প্রতি অবসর নিয়েছেন চাকরি থেকে। এখন ব্যবসা করছেন। আমার বোন পাঁপড়ি আমাকে কানে কানে বললো, 'মুসলমান হলে কী হবে, মানুষটি কিন্তু ভাল।' কমোডর আজিম একজন বঙ্গবন্ধু ভক্ত মানুষ। বাড়ি মুন্সীগঞ্জে। ওর সঙ্গে আলাপ করে আমার খুবই ভাল লাগলো। (বাংলাবাজার ২৪/১১/৯৮)'

এ আমার কথা নয়। এই উদ্ধৃতি দিলাম নির্মলেন্দু গুণের এক লেখা থেকে। লেখার শিরোনাম ছিল 'সেনাকুঞ্জে কিছুক্ষণ।' লেখাটি ছাপা হয়েছিল বাংলাবাজার পত্রিকায় ২৪ শে নভেম্বর ১৯৯৮ সালে। কানে কানে শোনা কথা মনে মনে ধরে রেখে গুণবাবু তা পত্রিকায় না লেখলেও পারতেন, সেনাকুঞ্জেই শেষ করতে পারতেন। কান কথাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে দেশবাসীকে জানাবার প্রয়োজন ছিল না। এ হচ্ছে আমার একটা সাদামাটা অভিমত। কিন্তু গুণবাবু এতকাল যে সত্যকে অন্তরে লালন করে আসছেন, সে সত্যের সঙ্গে তো লুকোচুরি খেলা খেলতে পারেন না। মুনাফিকীও করতে পারেন না। তাই সেনাকুঞ্জে প্রবেশের সুযোগ পেয়ে বোনের সঙ্গে দেখা হওয়ায় নিজের মনের কথাটা বোনের মুখ দিয়ে বের করে তার অন্তরে লালিত ও পোষিত সত্যকে একটা বিশেষ সুযোগে আবার দেশবাসীর সামনে আনলেন। এ বোনের কথা, না নিজের কথা, এ বিতর্কে গিয়ে লাভ নেই। এ হতে পারে তারই কথা অথবা বোনেরই কথা, এমনকি হতে পারে উভয়েরই কথা। কারণ, রক্ততো এক, চিন্তাও এক হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। বোনের সঙ্গে তার দেখা ও আলোচনা হয় ২১শে নভেম্বর সেনাকুঞ্জে সশস্ত্র বাহিনী দিবসের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে। ধন্যবাদ গুণবাবুকে তার স্পষ্টবাদিতার জন্য। তারা পারেন নিজেদের চিন্তা ও ধারণাকে সরাসরি প্রকাশ করতে। যা আমাদের অনেকের পক্ষে সম্ভব হয় না সত্যকে বিনা আবরণে প্রকাশ করতে।

'মুসলমান হলে কী হবে, মানুষটি ভাল'। এ কথা আমরা গুণবাবুদের থেকে এই প্রথম শুনিনি। তার ধর্মের পূর্ব পুরুষদের থেকে একই কথা আমরা বহুবার

www.pathagar.com

শুনেছি, বহু বই-পুস্তকে তা পাঠ করেছি এবং এখনও পাঠ করছি ও শুনছি। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র এবং বাল থ্যাকার, আদভানী এবং গুণবাবু পর্যন্ত প্রত্যেকেই এই চিন্তাধারার মানুষ। আগামীতে এমন কথা তাদের জাতগোষ্ঠী থেকে আরও শুনবো, তাতে কোন সন্দেহ নেই। গুণবাবুদের লোক মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও ভাল, যারা তাদের মান্য করেন, তাদের কৃষ্টি-সংস্কৃতির অনুসরণ করেন। এই থিওরিতে বাংলাবাজার পত্রিকার সম্পাদক মুসলমান হলেও ভাল মানুষ এবং যে সব মুসলমান মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান ভক্ত, তারাও ভাল মানুষ। আর বাদবাকি যারা আছে, গুণবাবুদের দৃষ্টিতে তাদের তিনটি দোষ। একটি হলো তারা মুসলমান আর দ্বিতীয়টি হলো তারা বাবু সংস্কৃতি পালন করেন না এবং তৃতীয়টি হলো গুণবাবুদের মত ও পথের তারা সমর্থক নন।

গুণবাবুর কথা পত্রিকায় পাঠ করে আমার বাল্য বয়সের একটি ঘটনা মনে পড়ে গেল। তখন আমার বয়স হবে বড়জোর ১২ বা ১৩ বছর। সিলেট জেলার বিয়ানীবাজার থানাধীন বালিঙ্গাগ্রামে খালার বাড়িতে থাকতাম এবং হরগোবিন্দ হাইস্কুলে লেখাপড়া করতাম। গ্রামটি ছিল কুশিয়ারা নদী তীরে। গ্রাম্য বাজারটিও ছিল নদী তীরে। বাজারের ঠিক বিপরীতে অর্থাৎ নদীর ওপারের গ্রামটির নাম আঙ্গারজুর। সেই গ্রামের নদী তীরবর্তীতে কৃষ্ণ নামে এক মাঝি পরিবারের বাস ছিল। কৃষ্ণের দু'টি ছেলে ছিল। বড় ছেলেটি খুবই ভাল ছিল। পিতাকে সব কাজেই সহযোগিতা করতো। তার নাম ছিলো খোকা। কৃষ্ণের ছোট ছেলের নাম ছিল গোপাল। সে ছিল আমারই সমবয়সী। নদী সাঁতরে বা নৌকায় পাড়ি দিয়ে এপারে আসতো এবং আমাদের সঙ্গে খেলাধুলা করতো। সে খুব ডানপিটে ছিল। বাবার অবাধ্য ছিল তা বলা যায়। বাপের কথা শুনতো না। একদিন কৃষ্ণ তার ছেলে গোপালের ওপর ক্ষেপে গিয়ে তাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে। কৃষ্ণ চিৎকার করে গোপালকে বকছে আর বকাবকির এক পর্যায়ে বলছে, মুসলমানরাও মা-বাবাকে মান্য করে, তুইতো তাদের চেয়েও অধম।

আমি কৃষ্ণের এই তিরস্কার বাক্য বোধহয় একাই শুনেছিলাম। আমার আশেপাশে অন্য লোক ছিল না। সেই বয়সেই আমি প্রচণ্ড ব্যথা পেলাম মনে। বাড়ি ফিরে খালাকে ঘটনাটি বললাম। তিনি একটি সুন্দর ও রহস্যময় হাসি আমাকে

www.pathagar.com

উপহার দিলেন, কিন্তু কোন জবাব দিলেন না। কৃষ্ণের সেই কথা এখনও আমি ভুলতে পারিনি। কৃষ্ণ এখন বেঁচে নেই, কৃষ্ণের বড় ছেলেও বেঁচে নেই, বেঁচে আছে শুধু গোপাল। সে ঐ গ্রামেই আছে। এখন সে বৃদ্ধ। বালিঙ্গা গ্রামে গেলে তার সঙ্গে দেখা হয়। যা হোক প্রশ্নটি হলো, এই আকাটমূর্খ কৃষ্ণ গুণবাবুদের তত্ত্বকথা কিভাবে পেল? পরবর্তী সময়ে এ কথার ওপর অনেক চিন্তা-ভাবনা করেছি। চিন্তা-ভাবনার পর ফলাফল পেলাম এই, এ কথা কৃষ্ণ বলেনি। কৃষ্ণ যে সমাজের মানুষ, সেই সমাজে মুসলমানদের নিয়ে আলোচনা হতো, চর্চা হতো, সত্য-মিথ্যা কাহিনী বলা হতো। কৃষ্ণরা ছিল নীরব শ্রোতা। শিক্ষাটা পেয়েছে সেখান থেকে। গুণবাবুদের দেয়া ইলিম তালিম তাদের কৃষ্ণরা পর্যন্ত পেয়েছে। গুণবাবুও এই ধারাবাহিকতার উত্তর পুরুষ। তবে এই গুণবাবু নতুন কোন কথা বলেননি। ইতিহাসের সিঁড়ির পর সিঁড়ি পার হয়ে যে ইলিম তালিম এ পর্যন্ত চলে এসেছে, গুণবাবুরা ওয়ারিশান সূত্রে হয়েছেন এর উত্তরাধিকারী।

মুসলমানরাও ভাল বা মন্দ এ বিচার তারা করুন। বাংলাদেশ ও পশ্চিবঙ্গের মুসলমানরা যে বাঙালি, এটাও গুণবাবুদের ধর্মের পূর্ব পুরুষ এবং উত্তর পুরুষরা স্বীকারই করেন না। ১৯৭৩ সালে নয়াদিল্লি থেকে বসন্ত চাটার্জির ইনসাইড বাংলাদেশ টুডে নামে যে পুস্তক প্রকাশিত হয়, সেই পুস্তকে তিনি বলেছেন, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ সমন্বয়ে বাংলার বাঙালি নিয়ে ভদ্রলোক সমাজ গঠিত হতো। অন্য কোন নিম্ন শ্রেণীর হিন্দু উপজাতীয় বা মুসলমান, তারা যত ভাল বাংলা বলুক না কেন বা যত উচ্চ সামাজিক মর্যাদাসম্পন্ন হোক না কেন, কোনক্রমেই বাঙালি বলে গণ্য হতে পারতো না।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পূর্ব পশ্চিম' প্রথম খণ্ডে এমন সংলাপও আছে, 'ওমা ঐ ছেলেটা মুসলমান বুঝি? আমিতো ভেবেছিলুম ও বাঙালি।'

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও খেলার মাঠে দেখেছেন বাঙালি ও মুসলমানদের মধ্যে ফুটবল খেলা। তিনি বাঙালি মুসলমানদের দেখেননি।

এভাবে উদ্ধৃতি তুলে ধরলে অনেক দেয়া যায়। আমি বলি, এক দিক দিয়ে এই চিহ্নিতকরণ ভাল। তারা মুসলমানদের অরিজিন পরিচয়েই পরিচিত করেন। মুসলমানদের মূল পরিচয় হচ্ছে তারা মুসলমান। এ মুসলমান বাংলাদেশের, না

www.pathagar.com

ইরানের, না মিসরের, না আমেরিকার, না ফ্রান্সের, তা পরের কথা। হ্যাঁ, রাষ্ট্রীয় ভৌগোলিক, ভাষা পরিচয় তো অবশ্যই থাকবে এবং থাকেও, কিন্তু সবই মূলকে কেন্দ্র করে। 'ধূম্রজালে মৌলবাদ' পুস্তকে আমি একাধিকবার গর্বের সাথে বলেছি, আমাকে যখন আমার চিন্তা আদর্শের শত্রু মৌলবাদী বলে, তখন আমি খুবই খুশি হই এবং আনন্দে আলহামদুলিল্লাহ বলি। শত্রুরা যখন আমাকে বলছে মৌলপন্থী, আগাপন্থী বা শাখাপন্থী বলেনি, তখন শত্রু থেকে মৌল পরিচয়ের সার্টিফিকেটে আমার তো ধন্য হওয়ার কথা। যে শত্রু আমাকে মৌলবাদী বলে গালি দেয়, সেই শত্রুকে আমি খুশিতে বাগ বাগ হয়ে মোবারকবাদ জানাই। সামনাসামনি হয়ে গালি দিলে মন চায় তার সাথে কোলাকুলি করি। ঠিক একইভাবে যারা এতদিন আমাদের বাঙালি পরিচয়কে বাদ দিয়ে শুধু মুসলমান বলে পরিচয় দিয়ে আসছে, তারা জেনে বুঝে হোক বা আবেগতাড়িত হয়ে অথবা হিংসা-বিদ্বেষ মনে নিয়ে হোক, তারা আমাদের আসল পরিচয়েই সম্বোধন করে আসছে। কারণ, আমরাইতো বলি, আমি মুসলিম, সারা বিশ্বই আমাদের ওয়াতান। ভৌগোলিক সীমানায় আমরা বাস করি বটে, কিন্তু মিল্লাতে মুসলিমীন হওয়ার কারণে আমরা ঈমান ও দ্বীনের দাবিতে বিশ্ব নাগরিক। যা হোক, মুসলমানদের পরিচয়ে মুসলমান ও মৌলবাদী পর্যন্ত এসে তারা যদি থেমে যেতেন, তাহলে আর কোন প্রশ্ন উঠতো না, কিন্তু তারা এ পর্যন্ত থামতে রাজি নন। তারা বাংলা ভাষার অভিধান থেকে গালি আহরণ করে সবই তাদের না পছন্দ মুসলমানদের ওপর বর্ষণ করেন। এ ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নম্বর ওয়ান, গালি বাহিনীর সর্দার।

এই বঙ্কিম বাবুর ওপর ঢাকায় কয়েক বছর আগে গালি খাওয়াজাতের একটি শ্রেণী জাঁকজমকের সঙ্গে সেমিনার-সিম্পোজিয়াম করেন। এই বঙ্কিম বাবুর লেখা বই-পুস্তকে যখনই মুসলমান প্রসঙ্গ এসেছে, তখন তিনি ম্লেচ্ছ, নেড়ে, পাষণ্ড, পামর, বানর, গো-খাদক, দাড়িওয়ালা, ডাকাত, হার্মাদ প্রভৃতি গালি সরাসরি দিয়েছেন অথবা পুস্তকের কোন চরিত্রের কণ্ঠ থেকে উচ্চারণ করিয়েছেন। বঙ্কিম বাবুর দৃষ্টিতে মুসলমানদের মধ্যে কোন ভদ্রলোক বা ভাল মানুষ নেই। একবার তিনি ঢাকায় এসেছিলেন। ঢাকা সফর করে কলিকাতা গিয়ে লিখেছিলেন, ঢাকার রাস্তায় তিনি দেখেছেন নেড়ে কুত্তা আর আদালতে দেখেছেন নেড়ে মুসলমান

www.pathagar.com

আসামি। এই বঙ্কিম বাবুকে আমাদের কেউ কেউ বলেন, ঋষি বঙ্কিম। এই বঙ্কিম বাবুই হাজী মুহসীন বৃত্তি পেয়ে লেখাপড়া শিখেছিলেন।

এখানে আমি আরও কয়েকটি উদ্ধৃতি পেশ করছি। দৈনিক দিনকালের সাবেক সহকারী সম্পাদক জনাব নুরুল ইসলাম এ ক্ষেত্রে আমাকে সাহায্য করেছেন। আমার সংগ্রহ তো রয়েছেই।

১। 'বীরের ধর্ম স্বদেশ রক্ষণ, হিন্দুর ধর্ম যবন নিধন'-নাট্যকার গিরিশ ঘোষ।

২। 'হিন্দুরা ভারতবর্ষ থেকে কেবল ইংরেজদের নয়, মুসলমানদেরও তাড়াতে চায়' সন্ধ্যা পত্রিকা : দার্শনিক পণ্ডিত ঋষি অরবিন্দ।

৩। 'মুসলমানরা জানে শুধু মেয়ে চুরি করে তাদের সংখ্যা বাড়াতে'-হাসু বানু উপন্যাস-প্রবোধ কুমার সান্যাল।

৪। 'বোম্বাই শহরের সকল মুসলমান হচ্ছে চোর, ডাকাত, গুন্ডা আর বদমায়েশ' শিবসেনা নেতা বাল থ্যাকার। এই 'ভদ্দরলোক' আর একবার বলেছিলেন, কাশ্মীরের মহিলাদের ধর্ষণ করা উচিত ভারতীয় সেনাদের।

৫। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী মিঃ গান্ধীর প্রার্থনা সভায় যোগ দিয়েও অসাম্প্রদায়িক থাকতে পারেননি। উগ্র হিন্দুরা চিৎকার দিয়ে বলেছিল, মুসলমান শূয়র, খুনি, চোর, গরুখোর-ওই অপজাতটাকে ফাঁসিতে লটকাও-দি লাস্ট ডেজ অব বৃটিশ রাজ-মসলে-লিউনার্দ।

৬। 'কলকাতা শহরে হিন্দুদের রেস্টুরেন্ট বা হোটেলে মুসলমানরা চা খেতে পারতো না-কমরেড মোজাফফর আহমদ 'কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতি কথা।'

৭। 'দেশ বিভাগের আগে ছাত্র জীবনে একবার নারায়ণগঞ্জের মিষ্টির দোকানে মিষ্টি খেতে চাইলে মিষ্টি বিক্রেতা আমাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়'। -নাজির হোসেন-ঢাকার কিংবদন্তী।

৮। 'বাঙালি মুসলমানরা শতকরা ৯৮ জন হিন্দু সম্প্রদায়ের নিম্নতম পর্যায় থেকে ধর্মান্তরিত'-জওহরলাল নেহেরু-ডিসকভারী অব ইন্ডিয়া।

www.pathagar.com

৯। শুদ্ধানন্দ স্বামী চেয়েছিলেন মুসলমানরা ধর্মান্তরিত হয়ে হিন্দু হয়ে যাক। তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, হিন্দু হতে হয় জন্মগতভাবে, ধর্মান্তরের মাধ্যমে নয়। মুসলমানরা হিন্দু ধর্মে দীক্ষিত হলে তাদের সম্পর্কে কি করা হবে? স্বামীজির উত্তর ছিল এই 'ধর্মান্তরিত মুসলমানদের জন্য এমন এক বর্ণ সৃষ্টি করবো, যাদের স্থান হবে শুদ্রদের চেয়েও নিচে'।

দৃষ্টান্ত, উদ্ধৃতি আর বাড়িয়ে লাভ নেই। এসব হলো দ্বিজাতিতত্ত্বের মৌলিক উপাদান। এ জন্য অটোবায়োগ্রাফী অব এন আননোন ইন্ডিয়ান গ্রন্থে নীরোদ চৌধুরী লিখেছেন, 'দ্বিজাতিতত্ত্বের জনক মিঃ জিন্নাহ নন। মুসলিম লীগও নয়। এর জনক আমরা হিন্দুরাই। আমরাই সতীর্থ মুসলিম ছাত্রদের সঙ্গে পাশাপাশি বসে ক্লাস করতে অস্বীকার করেছিলাম। কারণ, আমরা আবিষ্কার করেছিলাম পেঁয়াজের গন্ধ তাদের গা থেকে বেরোয়। আমরা তা সহ্য করতে পারি না। তাই আমরা ক্লাসে পার্টিশন করিয়ে নিয়েছিলাম। দ্বিজাতিতত্ত্বের সূচনা সেখান থেকেই।'

প্রখ্যাত ভারতীয় চিন্তাবিদ এম এন রায় তার হিস্টোরিক্যাল রোল অব ইসলাম' গ্রন্থে লিখেছেন, 'পৃথিবীর কোন সভ্য জাতিই ভারতীয় হিন্দুদের মতো ইসলামের ইতিহাস সম্বন্ধে এমন অজ্ঞ নয় এবং ইসলাম সম্বন্ধে এমন ঘৃণার ভাব প্রকাশ করে না। ভারতীয় হিন্দুদের কাছে সদ্বংশজাত, সুশিক্ষিত এমনকি প্রশংসনীয় সংস্কৃতি সম্পন্ন মুসলমানরাও ম্লেচ্ছ, অসভ্য ও বর্বর।'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এই অজ্ঞতা রোগে ভোগেন। তিনি 'গোরা' উপন্যাসে উৎপীড়িত এক মুসলমানকে উপদেশ ছলে বলেছেন, 'তোমাদের মহম্মদ ভালো মানুষ সেজে ধর্ম প্রচার করেননি।' গোরা-পৃষ্ঠা ১৩৯। এক প্রশ্নের জবাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মোতাহার হুসেন চৌধুরীকে বলেছিলেন, 'কুরআন পড়তে শুরু করেছিলাম, বেশি দূর এগুতে পারনি। আর তোমাদের রাসূলের জীবন চরিতও ভালো লাগেনি' প্রবন্ধ : ইসলামী সংস্কৃতির রূপরেখা, ডঃ মুস্তাফিজুর রহমান থেকে উদ্ধৃত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনেক পড়েছেন, অনেক জেনেছেন, অনেক লিখেছেন কিন্তু তিনি ইসলামকে জানেননি, জানবার চেষ্টাও করেননি,এ জন্য মুসলমানরা তার

www.pathagar.com

সাহিত্যেও আসেনি। তিনি অনেক জাতিকে জেনেছেন, কিন্তু প্রতিবেশী মুসলমানদের জানার আগ্রহও প্রকাশ করেননি। অথচ তিনিই লিখেছেন–

বহুদিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশির বিন্দু।

তিনি অনেক দেখেছেন। কিছুই বাদ দেননি, শুধু বাদ দিয়েছেন তারই প্রতিবেশী মুসলমান জাতটাকে। এই যখন 'বিশ্ব কবির' জানাজানির সংকুচিত দিগন্ত, মুসলমানদের সম্পর্কে তার জ্ঞানের কপাট বন্ধ, তখন গুণবাবুরা কতটুকুই বা অগ্রসর হতে পারেন? গুণবাবুদের বলছি, নাজির হোসেন নারায়ণগঞ্জের মিষ্টি দোকানে প্রবেশই করতে পারেননি মুসলমান হওয়ার কারণে, আপনি তো এই রাজধানীর সেনাকুঞ্জে হিন্দু হয়ে নিমন্ত্রণপত্র পেয়ে খানাপিনা করতে পারলেন। এবার তুলনা করুন তো এই মুসলমানরা আপনার ঐ জাতগোষ্ঠী থেকে উদার ও ভালো কিনা। গুণবাবু, অন্ধকার চিন্তার অন্ধকার গর্ত থেকে বের হয়ে আলোর দুনিয়াতে হাঁটাচলা করুন, আকাশের দিকে তাকান, বিভ্রান্তির আর ভ্রমের বদ্ধ কপাট খুলুন, প্রতিবেশীদের চিনবার চেষ্টা করুন, তাদের ইতিহাস, সভ্যতা ও সংস্কৃতি পাঠ করুন, তাহলে জানতে পারবেন ও বুঝতে পারবেন যে, সারাটি জীবন ভুলের মধ্যদিয়েই কাটিয়েছেন। আরও জানতে পারবেন মুসলমানরা কত উদার ও কত ভালো। আপনার মত লোক সেনাকুঞ্জে দাওয়াত পান, এ দ্বারা কি বুঝতে পারেন না এই জাতটা কত উদার? এই পড়ন্ত বয়সে মাত্র একবার সেনাকুঞ্জে গিয়ে বুঝলেন আপনার ভগ্নিপতি মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও ভালো লোক। চিনতে গুরু

www.pathagar.com

করলেন মাত্র। আরও আগে বাড়ুন, ভ্রান্তির বেড়াজাল থেকে বের হয়ে আসুন, মুসলমানদের জানতে চেষ্টা করুন, তাহলে হাজার হাজার ভালো মুসলমান পাবেন।

মুসলমানদের এত বড় গালি দেয়ার পরও যে আপনি অনুরূপ গালি খাননি, এদ্বারাও কি প্রমাণিত হয় না যে, মুসলমানরা সহনশীলতার দিক দিয়ে আপনাদের চেয়ে কত উচ্চে। আপনি গালি দিলেন আর এ দেশের মুসলমানরা আপনাকে মাফ করে দিলো। এর চেয়ে ভালো মানুষী আর কি চান? আমি কি ভারতে গিয়ে হিন্দুদের এমন গালি দিয়ে প্রাণটা নিয়ে বাংলাদেশে ফিরে আসতে পারবো? তবে আমার কৃষ্টি-সংস্কৃতি আমাকে এমন গালি দিতে 'এলাও' করে না এবং এমন গালিও আমি দেবো না। আপনার দাঁড়িপাল্লায় আপনার ওজন, আমার দাঁড়িপাল্লায় আমার ওজন। পৃথিবীতে ৫৭টি দেশ মুসলমানরা শাসন করে। পৃথিবীর সব দেশে মুসলমানরা রয়েছে। আপনি ক'টি মুসলমানকে চেনেন? নামের শেষে 'গুণ' যোগ করলেই গুণী হওয়া যায় না। দ্বার বন্ধ করে যদি ভ্রমটাকে আগলিয়ে ধরে রাখেন, তাহলে সত্য প্রবেশ কররে কি ভেন্টিলেটার দিয়ে? ভেন্টিলেটারেও যে মাকড়শার জাল।

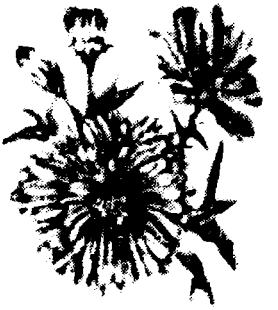

www.pathagar.com

যেমন কলিকাতা তেমন ঢাকা

'এই কলিকাতা নামক মহানগর আধুনিক বাবুদিগের পিতা কিংবা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আসিয়া স্বর্ণকার, বর্ণকার, কর্মকার, চর্মকার, পটকদার, মঠকার বেতনোপভুক হইয়া কিংবা রাজের, সাজের, কাঠের, খাটের, ঘাটের, মঠের, ইটের সরদারি, চৌকিদারী, জুয়াচুরি, পোদ্দারী করিয়া অথবা অগম্যগমন, মিথ্যাবচন, পরকীয় রমণী সংঘটনকামী, ভাঁড়ামি ও রাস্তাবন্দ দাস্য, দৌত্য গীতবাদ্য তৎপর হইয়া কিংবা পৌরহিত্য ভিক্ষাপুত্র গুরু-শিষ্যভাবে কিঞ্চিৎ অর্থ সঙ্গতি করিয়া কোম্পানির কাগজ কিংবা জমিদারী ক্রয়াধীন বহুতর দিবসাবসানে অধিকতর ধনাঢ্য হইয়াছেন।'

www.pathagar.com

'এই কলিকাতা নামক মহানগর আধুনিক বাবুদিগের পিতা কিংবা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আসিয়া স্বর্ণকার, বর্ণকার, কর্মকার, চর্মকার, পটকদার, মঠকার বেতনোপভুক হইয়া কিংবা রাজের, সাজের, কাঠের, খাটের, ঘাটের, মঠের, ইটের সরদারি, চৌকিদারী, জুয়াচুরি, পোদ্দারী করিয়া অথবা অগম্যগমন, মিথ্যাবচন, পরকীয় রমণী সংঘটনকামী, ভাঁড়ামি ও রাস্তাবন্দ দাস্য, দৌত্য গীতবাদ্য তৎপর হইয়া কিংবা পৌরহিত্য ভিক্ষাপুত্র গুরু-শিষ্যভাবে কিঞ্চিৎ অর্থ সঙ্গতি করিয়া কোম্পানির কাগজ কিংবা জমিদারী ক্রয়াধীন বহুতর দিবসাবসানে অধিকতর ধনাঢ্য হইয়াছেন।'

'এইসব ধনাঢ্য লোকদের শুধু ধন-ঐশ্বর্যই ছিল, কিন্তু শিক্ষাদীক্ষা, সুনীতি ও সদাদর্শের কোন বালাই ছিল না। সেই জন্য এদের প্রভাবে তখন সমাজের গতি নিম্ন ও বিকৃত পথেই চালিত হইয়াছিল। ইহাদের পুত্র ও পোষ্যগণই বিনা ক্লেশে অপরিমিত ধনসম্পদ ও অনিয়ন্ত্রিত প্রশ্রয় পাইয়া বিলাস ব্যসনকেই জীবনের মূল উদ্দেশ্য করিয়া সমাজের মধ্যে বাবু আখ্যা লাভ করিল। ইহাদের নিষ্কর্মা নীতিহীন জীবন একটা গ্লানিকর ব্যাধির মত সমাজ দেহকে দূষিত ও দুর্বল করিয়া তুলিয়াছিল। এইসব বাবুদের খোশামুদে মোসাহেব, ইয়ার, দালাল ইত্যাদি লোক নানা নীচ পরামর্শ ও কলুষিত আচরণের দ্বারা সমাজের মধ্যে অন্যায় ও পাপের গতি অবারিত করিয়া দিয়াছিল।'

এই দুটি উদ্ধৃতির প্রথমটি ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায়ের 'নববাবু বিলাস' পুস্তক থেকে আর দ্বিতীয়টি নেয়া হয়েছে ডঃ অজিত কুমার ঘোষের 'বঙ্গ সাহিত্যে হাস্যরসের ধারা' থেকে। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুস্তক থেকে নেয়া উদ্ধৃতিতে যেখানে 'কলিকাতা' ও 'বাবু' আছে, সেখানে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহী, খুলনা এবং বাবুর স্থানে মিয়া সাহেব বসালে আমাদের কথাও বলা হয়ে যায়। একই প্রক্রিয়া, একই চরিত্র, একই কর্মকাণ্ড, শুধু স্থানের, নামের পার্থক্য। ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায়ের তিনখানা বই, 'নব বাবু বিলাস', 'দূতী বিলাস' ও 'নববিধিবিলাস' এভাবে হুল ফুটানো বই। এরূপ বিরাট ও বিচিত্র প্রতিভার অধিকারী হয়ে তিনি পরবর্তীকালে জন-স্মৃতি থেকে কিভাবে নির্বাসিত হয়ে গেলেন, তা চিন্তা করলে

www.pathagar.com

বিস্মিত হতে হয়। জন-স্মৃতি থেকে নির্বাসিত হওয়ার একটি মাত্র কারণ খুঁজে পাওয়া যায় আর তা হচ্ছে এই, তাঁর সময়ে প্রাচীনপন্থী ও আধুনিকপন্থীদের মধ্যে যে কলমী লড়াই শুরু হয়, তিনি শক্তভাবে কলম ধরেছিলেন প্রাচীনপন্থীদের পক্ষে। এ কারণে তিনি আধুনিকপন্থীদের আলোচনায় খুবই কম এসেছেন। ধীরে ধীরে তিনি বিস্মৃত হয়েছেন এবং জন-স্মৃতি থেকেও হারিয়ে গেছেন। যাহোক, তিনি যে পন্থীই থাকুন না কেন তার কষাঘাত তখনও অনেকে সহ্য করতে পারেননি। এ কথা অবশ্য স্বীকার করি, ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায়ের ব্যঙ্গ মন্তব্য স্থানে স্থানে তীব্র এবং একপেশে ও রূঢ় হয়েছে। তিনি যে মন্তব্য করেছেন অর্থাৎ শহরে এসে ধনী হওয়ার যে ফর্মুলা বয়ান করেছেন, তা অনেকের ব্যাপারে অবশ্যই প্রযোজ্য, কিন্তু প্রত্যেকের ব্যাপারে প্রযোজ্য নয়। সরল ও সৎপথে কঠোর পরিশ্রম করে অনেকে ধনাঢ্য হয়েছেন, কিন্তু এ কথা সত্য যে, এদের সংখ্যা ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায়ের ধনাঢ্যদের তুলনায় অতি নগণ্য। সুতরাং গণতন্ত্রের সংজ্ঞানুযায়ী ভবানীবাবুর ফর্মুলাই গ্রহণযোগ্য। এরাই যখন বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ, তখন শহর জীবনে তাদের আধিপত্য এবং তাদের মন-মননের ঔরসজাত সন্তানদের দৌরাত্ম্য সীমাহীন।

কলিকাতা মহানগরী বা ঢাকা মহানগরীর কথাই বলুন, এইসব বাপের বেটা পৈতৃক সম্পদের গরমের বা ওয়ারিস সূত্রে প্রাপ্ত পিতার ধনে পোদ্দারী করে শহরগুলোকে ভাজা ভাজা করে খাচ্ছে। এদের বাপ-দাদাদের অনেকেই অভাবের তাড়নায় শহরে এসে কোথাও না কোথাও একটা ঠাঁই নেয়, বসার ব্যবস্থা করে, তারপর শোবার চৌহদ্দি ঠিক করে নেয়। তারপর ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বর্ণনা অনুযায়ী কোন না কোন একটা কাজের সূত্র আবিষ্কার করে লেগে পড়ে। গ্রাম ছাড়া অনেকের ছিল না শিক্ষা আর না ছিল কৃষ্টি-সংস্কৃতির দীক্ষা, ধুরন্ধরী বুদ্ধিটাই ছিল এক শ্রেণীর সম্বল। ওটা কাজে লাগিয়ে তাদের কেউ কেউ বিত্তের কয়েক সিঁড়ি উপরে উঠে যায়। এই চরিত্রের প্রভাব সমাজকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করে।

আজ আমরা যাদের মস্তান, চাঁদাবাজ, সন্ত্রাসী হিসেবে দেখছি, দেখছি যাদের নানা অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত অথবা দেখছি সমাজকে ভাজা ভাজা করে খাচ্ছে, আর হঠাৎ ক্ষমতার বা টাকার শিং গজিয়েছে, তাদের শিকড়ের খবর নিলে দেখা

www.pathagar.com

যাবে গোড়ায় ছিল নানা গলদ। উপকরণে যদি থাকে ত্রুটি, তাহলে সেই উপকরণ দিয়ে যা তৈরি হবে তা কখনো এক নম্বরী হতে পারে না। শিক্ষিতদের আধিক্যে শহর প্রায় ভরপুর থাকা সত্ত্বেও শহরে সামাজিকতার দুর্ভিক্ষ অবস্থা দেখা যায়, কেউ যেন কারো গায়ে লাগে না, অনেকে রাক্ষুসে ক্ষুধা নিয়ে ঘুরে, সুযোগ-সুবিধা পেলে আস্ত গিলে ফেলে, গিলে ফেলতে না পারলেও প্রচুর ক্ষতি তো করেই।

ধনাঢ্য হওয়ার বিভিন্ন চেষ্টা-তদবিরের যে সব লাইনের কথা ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায় বলেছেন, তা তার সময়ে অবশ্যই ছিল, আজও আছে তবে এখন নানা কারণে পরিবেশ-পরিস্থিতি এবং ধারা প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন আসার কারণে ধনী হওয়ার নতুন নতুন বেশ কিছু লাইন যোগ হয়েছে। নতুনভাবে সংযোজিত লাইনগুলোর অনেকটি সে আমলে ছিল না। আবার সে আমলের কিছু কিছু লাইন এখন আর নেই। সে সময় গোটা উপমহাদেশই একই শাসকের শাসনাধীন ছিল বলে সীমান্তের চোরাকারবার ছিল না। এখন চোরাকারবার রীতিমতো একটা ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছে। শুধু তাই নয়, ক্রমশ এই কারবার একটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পরিগ্রহ করে নিচের দিকে শিঁকড় বিস্তার করেছে আর উপরে এই বিষ বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে পড়ছে। এখন একে অবৈধ বলা হয়ে থাকলেও বৈধতার ছাড়পত্র পেয়ে জাতীয় অর্থনীতিকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করছে। এ লাইনে সরকারি-বেসরকারি অজস্রজন ধনাঢ্যের তালিকাভুক্ত হয়ে সমাজের এলিট হয়ে প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন এবং করছেন। এ জন্য কোন কোন কর্মচারী আর কর্মকর্তা মনের মতো চোরাকারবারী পয়েন্টে বদলীর জন্য লাখ লাখ টাকার ডাক হাঁকেন।

আগে ছিল না বস্তি ব্যবসা। এখন অনেকে বস্তি ব্যবসা করে বস্তা বস্তা টাকা রোজগার করছেন। যারা এর পৃষ্ঠপোষকতা করছে, তারাও ভাগ-বখরা পেয়ে পরিতৃপ্ত থাকছে। বস্তিগুলো এখন শুধু অনেকের ব্যবসায়ের পুঁজিই নয়, নানা অপরাধের সূতিকাগার বা উৎপাদন ক্ষেত্র হিসেবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। বস্তির ভূমিকা এখানেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, কোন কোন রাজনৈতিক দলের রাজনীতির কাঁচামাল বা পাকামাল হিসেবে বস্তি ব্যবহৃত হচ্ছে। ভোটার আসে বস্তি

www.pathagar.com

থেকে, লাঠিয়ালও আসে বস্তি থেকে, মিছিলের আর জনসভার লোকজনও এই উৎস থেকে আসে। নগর পরিবেশ এ দ্বারা যে কিভাবে দূষিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তা প্রশাসন কর্তৃপক্ষও স্বীকার করেন। বস্তির অস্বাভাবিক এবং অপরিকল্পিত বিস্তৃতি সুস্থ নগর পরিবেশের মোকাবিলায় একটা চ্যালেঞ্জ এবং সুস্থ মনন ও মানসিকতাসম্পন্ন মানুষের শিরোপীড়ার কারণ হলেও এদের গা-গতর স্পর্শ করার সাধ্য কারো নেই। একবার এক মন্ত্রী একটি বস্তি উচ্ছেদ করতে গিয়ে তিনি নিজেই উচ্ছেদ হয়ে পড়েন। সুতরাং কোন কোন দলের রাজনীতির স্বার্থে এবং দলের মস্তানদের অর্থনৈতিক স্বার্থে বস্তি থাকা ও বস্তির বিস্তৃতি যে অপরিহার্য, তা বিভিন্ন ঘটনার দ্বারা প্রমাণিত। ক্ষমতায় টিকে থাকা ও ক্ষমতায় যাওয়া উভয় ক্ষেত্রেই বস্তি সংশ্লিষ্ট বেনিফিশিয়ারীদের জন্য খুবই দরকার। এই ঢাকা রাজধানীতে একটা কথা বেশ প্রচলিত আর তা হচ্ছে : বস্তি, মস্তান আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যার পক্ষে, ক্ষমতার মসনদ তার, রাজনীতি ক্ষেত্রে দাপট তার, ক্ষমতার রাজধানী ঢাকা তার। রাজধানী শুধু ধনবান হওয়ার জায়গা হিসেবে বিবেচিত হওয়ার কথা ছিল না। রাজধানী হওয়া উচিত ছিল সব রকমের সৎ ও কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের আদর্শ ক্ষেত্র হিসাবে, যার প্রভাব পড়বে গোটা দেশ ও দেশবাসীর ওপর। কিন্তু তিক্ত হলেও সত্য যে, যা হওয়ার ছিল তা না হয়ে হয়েছে বিপরীত।

ধনী হওয়ার সৎ চেষ্টা করা, পরিশ্রমের মাধ্যমে জীবনের দুঃখ-কষ্ট দূর করা, আত্ম-দারিদ্র্য বিমোচনে সচেষ্ট হওয়া মোটেই দোষের নয়, গুণের কাজ। কিন্তু এই পরিবর্তনের পদ্ধতি যদি হয় অবৈধ, পাপ-পংকিল তথা বেআইনি, তাহলে এই ধারায় ধনী হওয়া মানে সমাজে নতুনভাবে অনাচার, জুলুম ও অপরাধের জন্ম দেয়া। বলাবাহুল্য, আমাদের রাজধানী এখন উন্মোচিত, ঢাকা অর্থে ঢাকা নেই।

পাবলিকের মধ্যে একটা আতংক। কখন যে কার অবস্থা কেমন হয় বা কেমন দাঁড়ায় তা বলা যায় না। পুলিশের হাতে নিহত রুবেলের বাবা পুলিশের উদ্দেশে বলেছিলেন, এটা কি মগের মুল্লুক? পুলিশরা প্রমাণ করে দিল মগের মুল্লুক না হলেও এটা শক্তিমানের মুল্লুক। পত্র-পত্রিকায় দেখি, কোন কোন ক্ষেত্রে পুলিশও

www.pathagar.com

ধর্ষণের কাজে আত্মনিয়োগ করেছে। বিচারের আগে রুবেলকে হত্যা করে পুলিশই রায় দিয়ে দিচ্ছে। ইত্তেফাকের সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি জনাব মইনুল হোসেন তাই যথাযর্থই বলেছেন, 'আইনের রক্ষক পুলিশ চাই ॥ মাস্তান পুলিশের প্রয়োজন নেই' '২৬/৭/৯৮ ইত্তোফাক।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে বলছি, আপনাদের আমলে ছিল এক জ্বালাতন, আমরা ভুগছি শত জ্বালাতনে। আপনাদের সময়ে কি মস্তান পুলিশ ছিল? আপনাদের সময়ে সরিষায় ভূত ছিল না, আমরা কিন্তু সরিষায় ভুত নিয়েই বাস করছি। তাদের সালাম দিতে বাধ্য হচ্ছি, নতুবা ডিবি পিছনে লাগতেও পারে। অসংস্কৃতিবান বাবুরা যেমন কলিকাতাকে নোংরা বানিয়েছে, তেমনি অসংস্কৃতিবান সাহেবরা ঢাকাকে অসংস্কৃতিবান করেছে। একই খেলা : যেমন কলিকাতায় তেমন ঢাকায়।

www.pathagar.com

ঈদের ছুটি কত দিন?

ঈদের ছুটি কত দিন হওয়া উচিত? কেউ কেউ বলেন, প্রতি ঈদে এক সপ্তাহের ছুটি থাকলে ওভার স্টে এক ভয়ঙ্কর ভাইরাস হয়ে বিরাজ করতো না। মুসলমানদের সবচেয়ে বড় দু'টি উৎসবের ছুটি তিন দিন হওয়া উচিত নয়। অনেক মুসলিম দেশে ঈদের ছুটি এক সপ্তাহ থাকে। প্রস্তাবটি বিবেচনার যোগ্য, তবে কথা আছে, আর সে কথাটি হচ্ছে এই, ৭ দিনের ছুটি ৭ দিনেই শেষ হবে এ গ্যারান্টি দেবে কে? ৩ দিন যদি ৯ দিনেও শেষ হয় না, তাহলে এক সপ্তাহ ক'সপ্তাহে শেষ হবে, এ হিসাব কে কষতে পারবেন?

www.pathagar.com

ঈদের ছুটি যেন শেষ হয় না। ঈদের ছুটি কত দিন? অফিসিয়াল ছুটি যাই থাক না কেন, অনেকের ছুটি কখন শুরু হয়, তা বলা যেমন মুশকিল, তেমনি শেষ হবে কবে তাও বলা মুশকিল, এমনকি ছুটি ভোগকারী অনেকে ছুটির শুরু ও শেষের সঠিক দিন-তারিখও বলতে পারেন না। জাতীয় দৈনিকগুলোর মন্তব্যমূলক সংবাদ শিরোনাম থাকে এমন, 'অফিস-আদালত রাস্তাঘাট ফাঁকা', 'ঈদের আমেজ কাটেনি', 'অফিস খোলার দিন অফিস প্রায় শূন্য' ইত্যাদি। প্রকাশিত জাতীয় দৈনিকগুলোতে থাকে এসব শিরোনাম। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, প্রতি বছর প্রত্যেক ঈদের ছুটির পর অফিস খোলার দিনের হাজিরা পরিস্থিতির বিবরণ থাকে পরবর্তী দিনে প্রকাশিত দৈনিকগুলোতে। অফিস খোলার দিন অফিসে হাজির না হওয়া এবং পত্রিকায় এসব খবর প্রতি বার ঈদের পর প্রকাশ করা যেন এক ট্রাডিশন হয়ে গেছে। এ ট্রাডিশন চলছে যুগ যুগ ধরে।

শুরুতে বলেছিলাম, ছুটি ভোগকারীর অনেকে ছুটির শুরু ও শেষের সঠিক দিন তারিখও বলতে পারেন না। এ মন্তব্য করলাম এ জন্য যে, ঈদের ছুটির এক সপ্তাহ পূর্ব থেকে অফিসিয়াল ছুটি শুরু না হলেও নন-অফিসিয়াল ছুটি শুরু হয়ে যায়। যেমন ঈদের ছুটি শুরু হওয়ার প্রায় এক সপ্তাহ পূর্ব থেকে কার্যত অফিসিয়াল কাজকর্ম প্রায় বন্ধই হয়ে যায়। যেমন কেউ কোন ফাইলের তাগাদা দিতে আসলে সাধারণত কেউ কেউ এ কথাও বলে থাকেন, আরে ভাই, অস্থির হয়ে পড়ছেন কেন, সামনে ঈদ, এখন ঝামেলা বাড়াবেন না। ঈদের পরে আসুন, তখন দেখা যাবে।

এভাবে অনেকে বলেন, আর অনেকে শুনেন। ঈদের পর যে দিন অফিস খোলে, তখন গেলে দেখা যায় অফিস প্রায় খালি। শতজন কর্মচারী ও কর্মকর্তার উপস্থিতিতে যে অফিস সরগরম থাকতো, সে অফিসে মাত্র ৫/৭ জন হাজির। এ দৃশ্য দেখে হয়তো ফাইলের তাগাদা দেয়া হলো না। ২/৩ দিন পর গিয়ে দেখা গেল হাজিরা বেড়েছে। যার ঘাটে ফাইল আটকা পড়েছে, তিনি হয়তো হাজির। যার সমস্যা তিনি অফিসার বা কর্মচারী সাহেবের কাছে খুশি মনে এগিয়ে গেলেন। তাকে ঈদ মোবারক, আসসালামু আলাইকুম দিয়ে ফাইলের কথাটি পাড়লেন।

www.pathagar.com

তখন অফিসার বা কর্মচারী ব্যক্তিটি হয়তো বললেন, কি যে সমস্যায় পড়লাম, আপনার ফাইল ডান পাশের ভদ্রলোকের আলমারিতে তালাবদ্ধ। তিনি ছুটি শেষ করে বাড়ি থেকে না আসা পর্যন্ত কিছুই করা যাবে না। তার ছুটি শেষ হবে আরও ৫ দিন পর। আপনি এক সপ্তাহ পর আসবেন।

ধরুন, এ সমস্যায় পড়েছেন আপনি। এ অবস্থায় কি করতে পারবেন? কিছুই করতে পারবেন না। এ কথাতো বলতে পারবেন না যে, ঈদের ছুটির আগে ফাইল ছিল আপনার কাছে। ঈদের বন্ধের সময় কিভাবে ফাইলটা আপনার ডানপাশের ভদ্রলোকের আলমারিতে গিয়ে ঢুকলো? এক টেবিল থেকে অন্য টেবিলে ফাইল যেতে লাগে দীর্ঘ দিন। ঈদের বন্ধে কি ফাইলের ঠ্যাং গজালো? না, আপনি কোন প্রশ্নই করতে পারবেন না, কোন জিজ্ঞাসা করা চলবে না। কারণ, ভদ্রলোকের মন যদি বিগড়ে যায়, তাহলে আপনার কাজ এক বছরও পিছিয়ে যেতে পারে। অতএব বিরক্ত করা চলবে না। কণ্ঠে অনুরোধ বাক্য, আর ঠোঁটে হাসি ছড়িয়ে বিদায় নেবেন, যদি কার্য উদ্ধার করতে চান।

ঈদের এক সপ্তাহ আগ পর মোট দু'সপ্তাহ সরকারি ও আধা-সরকারি প্রশাসনিক অফিসে এমনকি বহু প্রাইভেট অফিসেও স্বাভাবিক ধারায় ও গতিতে কাজকর্ম চলে না। এটা বাস্তব অবস্থা বা অফিস-চিত্র, তা স্বীকার করতে হবে। প্রতি বছর পত্র-পত্রিকায় এ চিত্রই তুলে ধরা হয়। প্রতিবার একই চিত্র। ঈদের ছুটির এক সপ্তাহ পূর্ব থেকে কাজকর্মের গতির যে ভাটা শুরু হয় এবং ভাঙ্গনের যে ঘণ্টা বাজে, সেই শূন্যতা পূরণ হতে লাগে ছুটির পরও প্রায় এক সপ্তাহ।

দুই ঈদে যদি এভাবে ১৫ দিন করে এক মাস কর্মহীন দিবস বিয়োগ হয়ে যায়, তাহলে তথাকথিত উৎপাদনের রাজনীতি অনুৎপাদনের খেসারত দিয়েই তো শেষ হয়ে যাবে। বাকি থাকবে কি? সাপ্তাহিক ছুটি তো মাসে ৪/৫টা আছেই। এছাড়া আছে সাধারণ ছুটি। অসুস্থতা ছুটি ও নৈমিত্তিক ছুটি তো বছর শেষ হওয়ার আগে ভোগ করা চাই। অর্জিত ছুটি তো অবশ্যই ভোগ করতে হবে। আরও আছে হরতাল, অবরোধ ও ঘেরাও। ধর্মঘট তো লেগেই আছে।

www.pathagar.com

আত্মনির্ভরশীল জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠার এসব মাইলফলক, না অন্য কিছু, এ বিতর্কে না গিয়ে বলা যায়, নাটাইর সুতা এভাবে ছাড়া উচিত নয় কোন পক্ষেরই। ঈদের তিন দিনের ছুটি ইচ্ছা খুশি লম্বা করলে ফলাফল যা দাঁড়ায় তা জাতীয় বিড়ম্বনার নামান্তর। এ কথা অবশ্য স্বীকার করি, অনেকেই যথারীতি ও যথানিয়মে সরকারি ছুটির সঙ্গে ব্যক্তিগত ছুটি যোগ করে ও ভোগ করে কর্মস্থলে ফেরেন। কিন্তু ওভারস্টেতে অভ্যস্তদের জ্বালাতন সবচেয়ে বেশি পীড়াদায়ক। কর্মস্থলে ফিরে আসার পর অজুহাতের অন্ত থাকে না। বাস রুটে ধর্মঘট, লঞ্চ ধরতে পারিনি, স্ত্রীর শরীর খারাপ, নিজের শরীর ভাল ছিল না, বাড়িতে জরুরি কাজ ছিল, অজুহাতের রীতিমত মিছিল। অনেকে সঙ্গে নিয়ে আসেন মেডিকেল সার্টিফিকেট। আমি অবশ্য বলি না, যতজন যত অজুহাত পেশ করেন, সবই ভুয়া ও ভিত্তিহীন। অনেকের কৈফিয়ত সঠিক, কিন্তু বিশ্বাস স্থাপনের ভিত্তি যে বহু আগে থেকে নড়বড়ে করে রাখা হয়েছে, তাই সঠিক ব্যক্তির সঠিক কারণকেও সংশয় আচ্ছাদন করে রাখে।

ঘুরে ফিরে একই প্রশ্ন, ঈদের ছুটি কত দিন হওয়া উচিত? কেউ কেউ বলেন, প্রতি ঈদে এক সপ্তাহের ছুটি থাকলে ওভার স্টে এক ভয়ঙ্কর ভাইরাস হয়ে বিরাজ করতো না। মুসলমানদের সবচেয়ে বড় দু'টি উৎসবের ছুটি তিন দিন হওয়া উচিত নয়। অনেক মুসলিম দেশে ঈদের ছুটি এক সপ্তাহ থাকে। প্রস্তাবটি বিবেচনার যোগ্য, তবে কথা আছে, আর সে কথাটি হচ্ছে এই, ৭ দিনের ছুটি ৭ দিনেই শেষ হবে এ গ্যারান্টি দেবে কে? ৩ দিন যদি ৯ দিনেও শেষ হয় না, তাহলে এক সপ্তাহ ক'সপ্তাহে শেষ হবে, এ হিসাব কে কষতে পারবেন? বদঅভ্যাসে অভ্যস্ত যিনি হোন, তিনি কোন নিয়মনীতি মানেন না। এদের সামলাবেন কিভাবে? বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষক ছুটি নিয়ে বিদেশে লেখাপড়া করতে গিয়ে আর ফেরেন না। বিদেশে চাকরি করেন আর এদিকে দেশের চাকরিটাও ঠিক রেখে মাস মাস মাহিনা ড্র করেন। ডবল রোজগার। অনেকে আবার লম্বা ছুটি নিয়ে বিদেশে ৩/৪ বছর চাকরি করে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। মোটকথা, এ সব

www.pathagar.com

অভ্যাসওয়ালাদের ওভারস্টে রোগ সারাবেন কি দিয়ে? ঈদের ছুটি তাদের এক মাস করে দিলেও অভ্যাসের কারণে আরও ১৫ দিন বাড়ি থাকবেন।

সুতরাং বলা যায়, কয়লার ময়লা শতবার ধুলেও যায় না। ঈদের ছুটি যত লম্বাই হোক, লেট লতিফদের লেট-এর কোন পরিবর্তন হবে না।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এ সমস্যার কিভাবে সমাধান করা যায়? সমাধান কি লম্বা ছুটি দিলে হবে, না এভাবেই চলতে থাকবে, না অন্য কোন বিকল্প আছে? এর সমাধান কি, তা বিভিন্ন অফিসের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষই ভেবে দেখবেন। তবে আমার একটা অনুরোধ, ছুটির মেয়াদ বর্ধিত করা হোক বা না হোক, অনিবার্য ব্যতিক্রম ছাড়া প্রত্যেকের ঈদের ছুটি যেন ছুটির প্রথম দিন থেকে শুরু হয় আর তা শেষ হয় ছুটির শেষ দিন। কোন অবস্থাতেই তা যেন ছুটির এক সপ্তাহ পূর্ব থেকে শুরু না হয় এবং নির্ধারিত ছুটির মেয়াদের পরও অনেক দিন না চলে। কষে টান দিলে হাতিও কাবু হয়ে পড়ে, লেট লতিফরা এমন আর কি। কিন্তু কথা হলো, যিনি অ্যাকশন নেবেন তিনি যদি ওভারস্টে রোগে আক্রান্ত হন?

www.pathagar.com

বিয়ে-শাদী-হাঙ্গা-ম্যারেজ

কেউ বিয়ে করেন, কেউবা করেন শাদী। কিন্তু অনেকেই এক সাথে বিয়ে-শাদীও করেন। কেউবা নিকাহও করে থাকেন, আবার হাঙ্গা-বিয়াও হরদম হচ্ছে। ভিন্ন রুচির স্বদেশী অনেক যুবক-যুবতী আবার বিয়ে-শাদী, নিকাহ-হাঙ্গার পথ ছেড়ে ম্যারেজ করে নতুন এক ধরনের সমাজ গড়ার সূচনা করছেন। তাদের ধর্মান্তরিত হতে হয় না, মালাবদল করে নিলেই হয়।

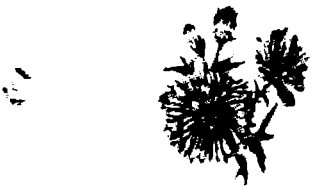

www.pathagar.com

কেউ বিয়ে করেন, কেউবা করেন শাদী। কিন্তু অনেকেই এক সাথে বিয়ে-শাদীও করেন। কেউবা নিকাহও করে থাকেন, আবার হাঙ্গা- বিয়াও হরদম হচ্ছে। ভিন্ন রুচির স্বদেশী অনেক যুবক-যুবতী আবার বিয়ে-শাদী, নিকাহ-হাঙ্গার পথ ছেড়ে ম্যারেজ করে নতুন এক ধরনের সমাজ গড়ার সূচনা করছেন। তাদের ধর্মান্তরিত হতে হয় না, মালাবদল করে নিলেই হয়।

যারা শাদীর পক্ষপাতী,তারা ম্যারেজের নাম শুনলেই লাহাওলা পড়েন, যারা ম্যারেজপন্থী,তাদের গলায় ছুরি বসালেও বিয়ে-শাদী বা নিকাহর নামও নেবেন না। যারা ইয়ে করে বিয়ে করেন আর কেলেঙ্কারি ঘটিয়ে হাঙ্গা করেন, তারা শাদী বা নিকাহকে মোটেই বরদাস্ত করতে চান না। মোটকথা, স্ব স্ব দৃষ্টিভঙ্গি সামাজিক মর্যাদা এবং আর্থিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিবাহের শ্রেণী বিভাগ হয়ে আছে, যারা যে শ্রেণীভুক্ত তারা সেভাবেই বিবাহ কার্য সম্পাদন করে থাকেন।

শ্রেণী বিভাগের কথা শুনে যারা ভাবছেন যে, বিবাহের আবার শ্রেণী বিভাগ কি। তাদের সামনে একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরলে বিবাহের শ্রেণী বিভাগকে বোধ হয় মেনে নেবেন।

যেমন ধরুন, পবিত্র হজ্ব পালন করতে যারা যান,তারা ফিরে আসলে সকলেই তাদের হাজী বলে থাকেন। কিন্তু বাস্তবে কি তাই? গরিব কেউ যদি কোনভাবে হজ্ব পালন করে আসেন,তবে তাকে পরিষ্কার উচ্চারণে কেউ হাজী বলেন না বরং 'হ' এবং 'অ'-এর মাঝামাঝি এক উচ্চারণ করে 'আজি' সাহেব বলে থাকেন। মধ্যবিত্ত বা উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের কেউ হজ সমাপন করে আসলে সকলেই বিশুদ্ধ উচ্চারণে 'হাজী সাহেব'ই বলে থাকেন। আবার উপরতলার কোন জনাবকে উচ্চস্তরের সম্বোধন করা হয়। তিনি আজি বা হাজী নন, তিনি হয়ে যান আলহাজ। অতএব বিয়ের ব্যাপারে শ্রেণী বিভাগে দোষ কি?

সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা থেকে একটি বিবাহ সংবাদ তুলে ধরছি। পাঠকগণ চিন্তা-ভাবনা করে বলবেন যে, ওটা বিয়ে, না শাদী; নিকাহ, হাঙ্গা, না ম্যারেজ। সংবাদটি হচ্ছে এই :

www.pathagar.com

কুমিল্লা জেলার কোটচাঁদপুরের কালীগঞ্জ বাসস্ট্যান্ডের মুসলিম হোটেলের একটি কক্ষে ১৯৮২ সালের ২৭শে নভেম্বর সদ্য বিবাহিতা নববধূকে ফেলে বর যৌতুকের ৭ হাজার টাকা, সোনার গহনা, কাপড়-চোপড় ইত্যাদি নিয়ে পালিয়ে যায়।

জীবননগরের ফিরোজ উদ্দিনের মেয়ে সুফিয়া খাতুনের বিয়ে ঢাকা জেলার লৌহজং থানার করাড়ি গ্রামের বাবুল হোসেনের সাথে কনের পিত্রালয়ে বিয়ে হয়। নগদ ৭ হাজার টাকা, সোনার গহনা, কাপড়-চোপড় ইত্যাদি এ বিয়েতে যৌতুক হিসেবে দেয়া হয়। সপ্তাহব্যাপী শ্বশুরালয়ে কাটানোর পর নববধূকে দেশের বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার নাম করে শ্বশুর বাড়ি থেকে এসে কালীগঞ্জ বাসস্ট্যান্ডের এক হোটেলে সুফিয়াকে অসহায় অবস্থায় ফেলে বাবুল হোসেন উধাও হয়।

পাঠকগণ এই বিয়েকে কোন শ্রেণীতে ফেলবেন জানি না। তবে এটা বিয়ে-শাদী বা নিকাহও যে নয়, তা আমি জোর দিয়ে বলতে পারি।

সমাজে এসব কেলেঙ্কারি কেন যে হচ্ছে তা বুঝে নিতে বেশি মাথা ঘামাতে হয় না। অনেক মা-বাবা আছেন, যাদের চাল-চলন আর কথাবার্তা থেকে কখনো এ কথা মনে হয় না যে, মেয়েকে পাত্রস্থ করার ব্যাপারে তারা বেমালুম শরীয়তের সীমানা লংঘন করতে পারেন। কিন্তু বাস্তবে তাই তারা করে থাকেন। মেয়ে যদি কোন ছেলের সঙ্গে একটা অবৈধ সংযোগ স্থাপন করতে পারে, তাহলে অনেক মা-বাবা আশীর্বাদ বলে গ্রহণ করে নেন। ছেলের আসা-যাওয়া, আনাগোনা, মেয়ের সঙ্গে সঙ্গোপনে আলাপন আর রং-তামাশাকে মা-বাবা শুধু আড়চোখে দেখেন আর চূড়ান্ত অগ্রগতির অপেক্ষা করতে থাকেন। ছেলেটি জামাই হবার আগেই জামাই আদর পায়, পরিবেশের সঙ্গে সেও একেবারে মিশে যায়। উত্তাপ যখন তুঙ্গে ওঠে, তখন কার্য সম্পাদনের চিন্তা জাগে। ডাক পড়ে ছেলের মুরুব্বিদের। যারা মুরুব্বিদের রাজি করিয়ে হাজির করাতে পারে তারা স্বজনদের নিয়ে শুভ কাজ সম্পন্ন করে আর যারা পারে না তারা একাই বন্ধু-বান্ধব দু'দশজন জোগাড় করে কার্য সম্পাদন করে থাকে। মেয়ের মা-বাবা একবারও ভেবে দেখেন না যে,

www.pathagar.com

ছেলেটির স্বভাব-চরিত্র কি, বাপ-দাদার বাড়ি-ঘর কোথায় এবং জ্ঞাতিগোষ্ঠীই বা কি। কপালের ওপর নির্ভর করার অজুহাতে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে কারবার সারেন। আল্লাহকে তারা সূচনাতে স্মরণ করেন না, করেন সমাপ্তিতে। আল্লাহর সীমা লংঘন করে যারা যাত্রা শুরু করে তাদের পথের দিশারী অবশ্যই আল্লাহ হন না, শয়তান হয়। এ ধরনের রং-তামাশার বিয়ে শ'তে দশটিও টিকে না।

মেয়ে সেয়ানা হয়েছে, বাপ রাত-দিন রুজি-রোজগার নিয়েই ব্যস্ত। মেয়ে সারাদিন কি করে তার কোন খবর নেই। মাও সংসারটা চাকর-বাকরদের ওপর ছেড়ে দিয়ে ঘুরে বেড়ান। এদিকে যা হবার তাই হয়। একদিন দেখা যায় মেয়েকেই পাওয়া যাচ্ছে না, পাশের বাসার ছেলেটিও নেই। বুঝতে আর বাকি থাকে না যে, কোথাকার পানি কোথায় গিয়ে গড়িয়ে পড়েছে। তারপর সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে বলতে হয়, বাবা তুমি যেখানেই থাক না কেন, চলে এস, তোমাকে কেউ কিছু বলবে না। টাকার দরকার থাকলে ঠিকানা দিও, টাকা পাঠিয়ে দেব। তোমার মা তোমার চিন্তায় শয্যাশায়িনী। মেয়ের মা-বাবা মেয়ের খোঁজ গোপনে নেন, পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেন বাধ্য হয়ে।

তারপর হয়তো ওরা একদিন আসে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও বরণ করে নিতে হয়, ভবিষ্যত পড়ে থাকে অনিশ্চয়তার গর্ভে। ক্রমে উচ্ছ্বাস হ্রাস পায়, তাপ কমে, বাস্তবতা প্রকট হয়ে ওঠে। শুরু হয় মিয়া-বিবির মান-অভিমান, কথা কাটাকাটি, গালাগালি, ছাড়াছাড়ি, শেষ পর্যন্ত আইন-আদালত ও কোর্ট-কাছারী পর্যন্ত গড়ায়। কাহিনী দেশ-দেশান্তরে ছড়ায়, বংশের মুখে পড়ে কলঙ্কের চুনকালি।

বিয়ের নামে যেগুলো হাঙ্গা হয়, সেগুলো অদ্ভূত প্রকৃতির। কখন যে বর আসে, কাজী সাহেব কখন আসেন আর কনে বিদায় হয় কখন, তা পাশের ঘরের মানুষও টের পায় না। তিন দিনের আলাপে গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি হয় আর চতুর্থ দিনে চিরস্থায়ী সম্পর্কের শুভ উদ্বোধন করে লীলা-খেলার সাময়িক সমাপ্তি টানেন। এই শ্রেণীর লোকদের বিয়ের লীলা-খেলা বুঝা বড় মুশকিল। বছরে দু'একটা হাঙ্গা-বিয়া তাদের জন্য যেন ডাল-ভাত তুল্য। বিয়ের নেহায়েত প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও অনেকে

www.pathagar.com

অর্থাভাবে বিয়ে করতে পারছেন না। অর্থাভাব পূরণ ছাড়াও মত-পথ, চিন্তা-চরিত্র, সভ্যতা-সংস্কৃতি, আকার-আকৃতি, বর্ণ, এ সবেরও ফয়সালা আগে করে নিতে হয়। সকলের পক্ষে এসব সমস্যার আশু সমাধান সম্ভব হয় না বলে বিয়ে করতে হয় বিলম্বে। কিন্তু এ হাঙ্গা-বিয়াওয়ালাদের কোন সমস্যা নেই, সুযোগ পেলেই বিয়ে করে। কেউ কেউ জীবনে ১০/১২টা বউয়ের মুখ দেখেছেন। এই বিয়ে-পাগলরা কিন্তু এক দিকে বিশেষ হুঁশিয়ার, ঘরে বউ মাত্র একটিই রাখে, বাকিগুলো হয় মেয়াদি বউ, প্রয়োজন শেষ হলেই কলার ছোবড়ার মত দূরে নিক্ষেপ করে থাকে। দেনমোহরের কোন বালাই নেই, আইন-আদালতে যাওয়ারও প্রয়োজন পড়ে না, পরিত্যক্ত নারীরও নাগড় যোগাড় করে নিতে বিশেষ কষ্ট হয় না। এই হাঙ্গা-বিয়াওয়ালাদের ছিলছিলা এভাবেই জারি রাখা হয়েছে।

বিভিন্ন শ্রেণীর বিয়ে নিয়ে পৃথক পৃথক আলোচনা এই পরিসরে সম্ভব নয়, এখানে শুধু ম্যারেজওয়ালাদের সম্পর্কে দু'কথা বলছি।

এই ম্যারেজওয়ালাদের প্রতাপ সমাজে বড্ড বেশি। ওরা জাত-ধর্ম মানে না, মিয়া-বিবি, নিজ নিজ ধর্মে থেকেও আঙটি বদল আর মালা বদল করে 'ম্যারেজ সিরিমনী' সাড়ম্বরে উদযাপন করতে পারেন। সমাজ বা রাষ্ট্র তাদের ব্যাপারে কিছুই বলে না। কারণ, সমাজের ওপর তলায় তাদের অবস্থান। হাকিমের এজলাস আর কাজীর দরবার তাদের পক্ষে।

বিয়ের এক বিখ্যাত ঘটকের থেকে একবার শুনেছিলাম যে, আমাদের সমাজে নাকি বাইশ ধরনের বিয়ে প্রচলিত। তন্মধ্যে প্রেমের বিয়ে নাকি আট ধরনের। আমাদের আলোচ্য বিয়েটি কোন্ শ্রেণীর বিয়ে তা জানা সম্ভব হয়নি। জীবননগরের সেই কনেটি হোটেলের কক্ষে একা একা কতক্ষণ অপেক্ষা করেছিল এবং অবশেষে ঘটনাটা কিভাবে প্রকাশ পেল তা জানা না গেলেও এ কথা বেশ বুঝা যায় যে, কনেটি মহা মুসবিতে পড়েছিল। যৌতুক শিকারী ওই যুবকটি কোন নিরুদ্দেশের পথে যে পাড়ি জমিয়েছে এবং আদৌ সে ফিরে আসবে কিনা তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানেন না। দোয়া করি ওই দুষ্ট লোকটি সুমতি ফিরে পাক,

www.pathagar.com

ষোড়শীর বুকের জ্বালা বিদুরিত হোক আর তার চোখের পানি আনন্দাশ্রুতে রূপান্তরিত হোক। প্রসঙ্গত আমি সুফিয়া খাতুনের বাবাকে উদ্দেশ্য করে সকল মা-বাবাদের কাছে একটি মাত্র নিবেদন করছি :

অন্যের হাতে নিজ কন্যাকে তুলে দেবার আগে পাত্রের বাপ-দাদার পরিচয়টা মেহেরবানী করে জেনে নেবেন, জেনে নেবেন ছেলেটির স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে। সমন্বয় ছাড়া মিলন মস্ত বড় একটা ভেজাল। সমন্বয় হতে হবে মত, পথ, চিন্তা, চরিত্র, চেহারা, সম্পদ ও বর্ণের। অন্যথায় জীবননগরের ঐ মা-বাবার মত অনেক মা-বাবা কপালে করাঘাত করতে থাকবেন আর অনেক সুফিয়া খাতুনই মা-বাবার আহাম্মকির নির্মম শিকারে পরিণত হয়ে দুঃখের জিঞ্জিরে সারা জীবন বন্দিনী হয়ে বিলাপ করতে থাকবে।

জাত-কুলের নাম-নিশানা নেই, বাপ-দাদার পরিচয় নেই, পারিবারিক কৃষ্টি-সংস্কৃতি জানা নেই, লন্ডনী কইন্যা আর গ্রীন কার্ডওয়ালা ছেলেকে শিকার ধরতে গিয়ে কত মা-বাবা কেঁদে কেঁদে বুক ভাসাচ্ছেন, সিলেটে গেলে শুনতে পারবেন সকরুণ বিলাপ কাহিনী। অতএব, সাবধান থাকবেন মা-বাবারা, যদি সন্তানদের জন্য দরদ রাখেন।

www.pathagar.com

আব্রাহাম লিংকন : খুনির পিস্তল

যদি হত্যার হাতিয়ারকে মূল্য দেয়া হয়, তাহলে হাতিয়ারের সাথে সাথে 'হত্যা'ও মূল্য পেয়ে যায় এবং হত্যাকারীও ঐতিহাসিক মর্যাদায় ভূষিত হতে পারে। কারণ, হত্যার হাতিয়ার, হত্যার মোটিভ আর হত্যাকারী, এই তিন অভিন্ন, অবিচ্ছেদ্য এবং একই দেহের বিভিন্ন অঙ্গও বলা যায়। হত্যার হাতিয়ার যদি ৭৭ হাজার ডলার মূল্য পায়, তাহলে হত্যার ব্যাপারটি কমপক্ষে কয়েক লাখ ডলার মূল্যে মূল্যায়িত হতে পারে আর হত্যাকারীর ঐতিহাসিক মূল্য কোটি ডলারে পৌঁছতে পারে। তারা শুধু হাতিয়ারকে নিলেন, কিন্তু বাকি দু'টিকে নিলেন না, তা কিন্তু সঠিক হলো না। তবে একটা কথা ঠিক, হত্যার হাতিয়ারকে মূল্য দিয়ে প্রকারান্তরে আমেরিকায় ঐতিহাসিক হত্যাকাণ্ডকে স্বীকৃতি দেয়া হলো ঐতিহাসিক মর্যাদা দিয়ে।

www.pathagar.com

আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা রয়টার পরিবেশিত ১৯৯৪ সালের জুন মাসের অনেক খবরের মধ্যে একটি খবর ছিল এই, আব্রাহাম লিংকনের হত্যায় ব্যবহৃত পিস্তল ৭৭ হাজার ডলারে বিক্রি হয়েছে। পিস্তলটি ছিল আব্রাহাম লিংকনের হত্যাকারী জন ওইলকিনস বুথ-এর। ১৯৯৪ সালের ৩১শে মে মঙ্গলবার সানফ্রান্সিসকোতে নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। 'বাটারফিল্ড এন্ড বাটারফিল্ড' নামক প্রতিষ্ঠানটি ছিল এই নিলামের আয়োজক।

আয়োজকরা জানান, 'সিঙ্গেল সট' ঐ অস্ত্রের নাম 'হেনরী ডিরিঙ্গার পারকুশান পকেট পিস্তল।' এটি কিনেছেন একটি জাদুঘর কোম্পানি 'রিপ্লাইজ বিলিভ ইট অর নট।' এই কোম্পানির বিশ্বব্যাপী ২১টি জাদুঘর রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় অস্ত্র জাদুঘরের তত্ত্বাবধায়ক ফিলিপ স্ক্রেলার বলেন, এই পিস্তলটি ১৮৬৫ সালের ১৪ই এপ্রিল আব্রাহাম লিংকনকে হত্যার কাজে ব্যবহৃত হয়েছিল। লিংকন এই দিন ফোর্ড থিয়েটারে নিহত হন। হত্যাকারীর কাছে দু'টি পিস্তল ছিল। মিঃ বুথ প্রেসিডেন্টকে গুলি করে প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা বেষ্টনি থেকে ঝাঁপ দেয়ার সময় যখন পড়ে যায়, তখন ওই দ্বিতীয় পিস্তলটি ফেলে দেয়। পর দিন ছুতার মিস্ত্রি জেমস গিফর্ড ওই পিস্তলটি দেখেন এবং কাউকে কিছু না বলে নিজের পকেটে লুকিয়ে রাখেন। ১৮৬৭ সালে গিফর্ড এটি তার বন্ধু জর্জ গুডউইনকে দেন। গুডউইন ১৮৮০ সালে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যু পর্যন্ত এটি তার হেফাজতে ছিল। গুডউইনের মৃত্যুর পর তার স্ত্রী পিস্তলটি গুডউইন-এর ব্যবসায়িক বন্ধু জর্জ প্লোম্যানকে দেন। প্লোম্যান-পরিবারের পর এটি একজন ঐতিহাসিকের কাছে বিক্রি করা হয়। ১৯৯৪ সালের ৩১শে মে মঙ্গলবার পিস্তলটি বিক্রির জন্য পাঠানো হয় অজ্ঞাত একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান থেকে।

আব্রাহাম লিংকনের আততায়ী জন ওইলকিনস বুথের পিস্তলের নিলাম-কাহিনী বর্ণনা করা আমার এ আলোচনার কেন্দ্রীয় বিষয় নয়, কেন্দ্রীয় বিষয় হচ্ছে আততায়ীর পিস্তল এত মর্যাদা পেল কিভাবে। নিলাম বর্ণনা পেশ করা সত্ত্বেও পাঠকদের

www.pathagar.com

পটভূমি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল রাখার প্রয়োজন বোধ করি। তাই এসব কথা বলতে হলো।

যুক্তরাষ্ট্রের এ পর্যন্ত চারজন প্রেসিডেন্ট ক্ষমতায় থাকাকালীনই আততায়ীর হাতে নিহত হন। ১৬তম প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন নিহত হন ১৫ই এপ্রিল ১৮৬৫ সালে, ২০তম প্রেসিডেন্ট গেরীফিল্ড নিহত হন ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৮৮১ সালে, ২৩তম প্রেসিডেন্ট সেফিনলী নিহত হন ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯০১ সালে আর ৩৫তম প্রেসিডেন্ট কেনেডি নিহত হন ২২ শে নভেম্বর ১৯৬৩ সালে। অন্যান্য আততায়ীর পিস্তল বা বন্দুক পাওয়া গেছে কিনা অথবা পাওয়া গেলে এমন মর্যাদা ও গুরুত্ব দেয়া হয়েছে কিনা তা জানি না। এদিক দিয়ে আব্রাহাম লিংকনের আততায়ী নিঃসন্দেহে একজন ভাগ্যবান ব্যক্তি।

কেন জন ওইলকিনস বুথ-এর পিস্তলের এত ঐতিহাসিক মূল্য দেয়া হলো, যে পিস্তল দিয়ে সে আমেরিকার একজন জনপ্রিয় ও খ্যাতিমান প্রেসিডেন্টকে হত্যা করেছিল? এর রহস্য আমার দ্বারা উদঘাটন করা সম্ভব নয়। যদি হত্যার হাতিয়ারকে মূল্য দেয়া হয়, তাহলে হাতিয়ারের সাথে সাথে 'হত্যাও' মূল্য পেয়ে যায় এবং হত্যাকারীও ঐতিহাসিক মর্যাদায় ভূষিত হতে পারে। কারণ, হত্যার হাতিয়ার, হত্যার মোটিভ আর হত্যাকারী, এই তিন অভিন্ন, অবিচ্ছেদ্য এবং একই দেহের বিভিন্ন অঙ্গ বলা যায়। হত্যার হাতিয়ার যদি ৭৭ হাজার ডলার মূল্য পায়, তাহলে হত্যার ব্যাপারটি কমপক্ষে কয়েক লাখ ডলার মূল্যে মূল্যায়িত হতে পারে আর হত্যাকারীর ঐতিহাসিক মূল্য কোটি ডলারে পৌঁছতে পারে। তারা শুধু হাতিয়ারকে নিলেন, কিন্তু বাকি দু'টিকে নিলেন না, তা কিন্তু সঠিক হলো না। তবে একটা কথা ঠিক, হত্যার হাতিয়ারকে মূল্য দিয়ে প্রকারান্তরে আমেরিকায় ঐতিহাসিক হত্যাকাণ্ডকে স্বীকৃতি দেয়া হলো ঐতিহাসিক মর্যাদা দিয়ে।

বর্তমান বিশ্বে অনেক ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের ব্যবহৃত জিনিসপত্র উচ্চমূল্যে নিলামে বিক্রি হয়েছে এবং হচ্ছে, যেমন টুপি, লাঠি, ডায়রি, কলমদানী, কলম,

www.pathagar.com

পালংক, জুতা ইত্যাদি। বিশ্ব বরেণ্য কৌতুকাভিনেতা চার্লি চ্যাপলিনের মৃত্যুর দশ বছর পর তার ব্যবহৃত টুপি, ছড়ি ও এক জোড়া জুতা ১৯৮৭ সালের ডিসেম্বর মাসে অপ্রত্যাশিত চড়ামূল্যে বিক্রি হয়। 'দ্য গ্রেট ডিক্টেটর' ছবি সুটিংয়ের সময় চ্যাপলিন এ সব ব্যবহার করেছিলেন। ছবিটি ১৯৪০ সালে প্রথম পর্দায় দেখানো হয়। সেটা ছিল চ্যাপলিনের প্রথম সবাক ছবি।

ক্রিস্টির নিলাম কক্ষে চ্যাপলিনের টুপি ও ছড়ি বিক্রি হয় ৮ হাজার পাউন্ডে। জর্জ স্ট্রেকার নামক ডেনমার্কের এক নাগরিক এই দু'টি ক্রয় করেন। বুট জোড়া কিনে নেয় সুইজারল্যান্ডের একটি জাদুঘর সাড়ে ৩৮ হাজার পাউন্ডে। নিলামে চ্যাপলিন সম্পর্কিত মোট ২৫৭টি সামগ্রী ২ লাখ ৮৫ হাজার ৩শ' ২৭ ডলারে বিক্রি হয়। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ফিল্ম, পোস্টার, লিথোগ্রাফ, খেলনা, স্বাক্ষর দেয়া ছবি এবং 'দ্য গ্রেট ডিক্টেটর'-এর মূল স্ক্রিপ্ট।

নেপোলিয়ানের টুপিও বিক্রি হয়েছে ১৯৭৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। হেলেনা দ্বীপে নির্বাসনে যাওয়ার সময় নেপোলিয়ানের কাছে যে টুপি ছিল, তা নির্বাসনে যাওয়ার সময় জাহাজের একজন নাবিককে এই টুপিটি দিয়েছিলেন। নেপোলিয়ানের বিয়ের পালংকও ১৯৮০ সালের ২১ শে নভেম্বর বার্নে ২ লাখ ১০ হাজার সুইস ফ্রা অর্থাৎ প্রায় তৎকালীন বিনিময় হারে ১ লাখ ২৬ হাজার মার্কিন ডলারে নিলামে বিক্রি হয়। হিটলার ও মুসলিনীরও অনেক কিছু নিলামে বিক্রি হয়েছে। শুধু তাদেরই নয়, অনেক ঐতিহাসিক ও বিশ্ব বরেণ্য ব্যক্তির রেখে যাওয়া বহু প্রিয় বস্তু নিলামে বিক্রি হয়েছে এবং আগামীতেও বিক্রি হবে। ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের ভালবাসার এ উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। নবীনেরা তা থেকে জীবন গঠনের প্রচুর অনুপ্রেরণাও পায়। কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো, খুনির পিস্তল কার কি উপকারে লাগবে এবং তা থেকে নবীনেরা কি শিখতে পারবে একমাত্র হত্যা ছাড়া? তাহলে কি আমি এ কথা ধরে নিতে পারি যে, আমেরিকায় মূল্যবোধের বিপরীত স্রোত প্রবাহিত হতে শুরু হয়েছে? আমেরিকার ইতিহাস-সচেতন নাগরিকরা কি

www.pathagar.com

খ্যাতি আর কুখ্যাতির সংজ্ঞা নতুন করে করতে যাচ্ছেন? আমেরিকার তরুণরা এখন হয়তো ভাবতে শুরু করবে যে, তাদের সমাজে খ্যাতির পালাবদল ঘটছে। আমেরিকার সেরা সেরা ব্যক্তিদের হত্যা করলে খুনির হাতিয়ার উক্ত মূল্যে নিলামে যায় এবং ঐতিহাসিক মর্যাদা পায় আর একই সাথে তাদের নামও বিশ্বব্যাপী প্রচার পায়, এ ধারণা কি জন্ম নেবে না?

আব্রাহাম লিংকনের আততায়ীর পিস্তল ৭৭ হাজার ডলারে বিক্রয় করে খুনির পিস্তলের যে মর্যাদা দেয়া হলো, তা যদি গ্রহণ করে নেয়া হয় ইতিহাস হিসেবে, তাহলে আব্রাহাম লিংকনের প্রতি আমেরিকাবাসীর শ্রদ্ধাবোধ আর তার হত্যাকাণ্ডের প্রতি আমেরিকাবাসীর ঘৃণা ও ধিক্কারের কি গতি হবে?

আমার মনে হয়, এদ্বারা খুনকে স্বীকৃতি দেয়া হলো, খুনিকে ঐতিহাসিক মর্যাদা দেয়া হলো, খুনকে ঐতিহাসিক স্টেটাস দেয়া হলো। আমি জানি না, ভবিষ্যতে শিষ্টের দমনে দুষ্টদের আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যবহার করা হবে কিনা। যদি ব্যবহার করা হয়, তাহলে আমি অবাক হবো না।

যে আমেরিকা ইসরাইলকে জন ওইলকিনস বুথের ভূমিকায় নামিয়েছে মুসলমানদের দমন, নিয়ন্ত্রণ ও হত্যার জন্য, সে আমেরিকা অবশ্যই পারে আব্রাহাম লিংকনকে ছেড়ে দিয়ে তার খুনি জন ওইলকিনস বুথকে লুফে নিতে। নগ্নতা হয় কারও সংস্কৃতি আর কারও জন্য অপসংস্কৃতি। ঐতিহাসিক মর্যাদাদানের যে ফর্মুলা আমেরিকায় নতুনভাবে তৈরি হয়ে বাস্তবায়িত হলো, তা আমেরিকার সংশ্লিষ্টদের জন্য হতে পারে ঐতিহাসিক মর্যাদাদানের নতুন এক ধারা, কিন্তু আমরা মনে করি, তা ইতিহাসকে বেইজ্জত করার সামিল।

বলাবাহুল্য, পৃথিবীর যে কোন দেশের চেয়ে বেশি সন্ত্রাস, হত্যা, ধর্ষণ ও ডাকাতি আমেরিকাতেই হয়ে থাকে। অথচ এই আমেরিকাই গোটা দুনিয়াকে বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বকে আইন ও নৈতিক মূল্যবোধ শেখায়। সেই আমেরিকা

www.pathagar.com

খুনির পিস্তলকে অত্যধিক মূল্য দিয়ে এটা প্রমাণ করলো যে, নতুন ইতিহাস সৃষ্টির জন্য তারা নিয়ম-নীতিকে পাল্টাতে পারে, এমনকি আব্রাহাম লিংকনের মত ব্যক্তিত্বকে অবমূল্যায়িত করতে পারে। খুনির পিস্তলকে উচ্চে তুলে ধরে তারা আব্রাহাম লিংকনকে আবার হত্যা করলো। এ কথা কি বলা যায় না যে, বুশরা এসব ঐতিহাসিক খুনের ঘটনা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ভিন জাতি ও ভিন ব্যক্তিত্ব হত্যার নেশায় বুঁদ হয়ে আছেন?

www.pathagar.com

ড. নীলিমার অন্তিম ইচ্ছা

টেলিভিশন রুমে গেলাম। একটা আসন নিয়ে বসলাম। দু'তিন মিনিট দেখার পর প্রোগ্রামটি শেষ হয়ে গেল। কারণ, বেশ কয়েক মিনিট আগে থেকে শুরু হয়েছিল। বলা যায়, আমি শেষের দিকের শ্রোতা-দর্শক হয়েছিলাম। অনুষ্ঠানটির নাম ছিল 'খোলা জানালা'। স্মৃতিচারণমূলক অনুষ্ঠান। তিনি কোথায় লেখাপড়া করেছেন, কার কাছে করেছেন, তার ক'টি সন্তান, মরহুম শেখ মুজিবুর রহমানের পরিবারের সাথে তার কি সম্পর্ক ছিল, এই পরিবারের কে তার ছাত্রী ছিল, কারা তাকে ফুফু ডাকতো, কে তাকে আপা ডাকতো, তিনি বলে যাচ্ছিলেন। শেষ কথা বললেন, আগস্ট মাস আসলেই আমি কাঁদি। এমন প্রিয়জনদের নির্মম হত্যা আমি ভুলতে পারি না। চোখের পানি ফেলি। তারপর তার শেষ কথা হলো, মরবার সময় তার (শেখ মুজিবুর রহমানের) নাম হৃদয়ে ও মুখে নিয়ে যেন মরতে পারি, এই কামনা করি।

www.pathagar.com

১৯৯৯ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর বিকেল ৩টা অথবা সাড়ে তিনটার সময় আমার রুমে বসে পড়ছি। পাশের রুমে টেলিভিশন অন করে ছোট ছেলে ফয়সাল কি একটা প্রোগ্রাম দেখছিল। আমার রুমে বসেই শুনছি ড. নীলিমা ইব্রাহীমের কণ্ঠ। আগ্রহ হলো তার কথা শোনার। এই অবেলা কি এমন প্রোগ্রাম চলছে, তা দেখার ও শোনার কৌতূহল হলো। টেলিভিশন রুমে গেলাম। একটা আসন নিয়ে বসলাম। দু'তিন মিনিট দেখার পর প্রোগ্রামটি শেষ হয়ে গেল। কারণ, বেশ কয়েক মিনিট আগে থেকে শুরু হয়েছিল। বলা যায়, আমি শেষের দিকে শ্রোতা হয়েছিলাম। অনুষ্ঠানটির নাম ছিল 'খোলা জানালা'। স্মৃতিচারণমূলক অনুষ্ঠান। তিনি কোথায় লেখাপড়া করেছেন, কার কাছে করেছেন, তার ক'টি সন্তান, মরহুম শেখ মুজিবুর রহমানের পরিবারের সাথে তার কি সম্পর্ক ছিল, এই পরিবারের কে তার ছাত্রী ছিল, কারা তাকে ফুফু ডাকতো, কে তাকে আপা ডাকতো, তিনি বলে যাচ্ছিলেন। শেষ কথা বললেন, আগস্ট মাস আসলেই আমি কাঁদি। এমন প্রিয়জনদের নির্মম হত্যা আমি ভুলতে পারি না। চোখের পানি ফেলি। তারপর তার শেষ কথা হলো, মরবার সময় তার (শেখ মুজিবুর রহমানের) নাম হৃদয়ে ও মুখে নিয়ে যেন মরতে পারি, এই কামনা করি।

শুনে তো আমি অবাক! এমন কামনা-বাসনার কথা তো আমি আর কোন মুসলমানের কণ্ঠে শুনিনি। বই-পুস্তকেও এমন ঘটনা পাঠ করেছি বলে আমার মনে পড়ে না। এই মহিলা কি কথা বলেন? নিষ্ঠাবান খ্রিস্টানরা খ্রিস্টের নাম মুখে নিয়ে মরার ইচ্ছা করেন, বৌদ্ধরা মৃত্যুকালে বৌদ্ধের নাম মুখে নিয়ে মরতে চান, হিন্দুরাও হরিনাম জপ করে মরার আকাঙ্ক্ষা করেন আর মুসলমানরা তো মওতের সময় কলেমা পাঠ করে মরতে চান। যে কলেমায় আছে আল্লাহ ও রসুল (সাঃ)-এর নাম। কোন মা-বাবার অতি ভক্ত সন্তানও এ কথা বলে না যে, যখন আমার মৃত্যু হবে, তখন আমার মা-বাবাকে ডাকতে ডাকতে যেন মরি। যে কোন ধর্মাবলম্বী সন্তান হোক মা-বাবার নাম জপকরে মরতে চায় না। অথচ ড. নীলিমা ইব্রাহীম তার রাজনৈতিক নেতার নাম মৃত্যুর সময় হৃদয়ে মুখে নিয়ে মরার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন! শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানাকেও যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে,

www.pathagar.com

আপনারা যখন মরবেন, তখন কি নাম জপ করে মরতে চান? আমার বিশ্বাস, তারা ভুলে এ কথা বললেন না যে, তারা তাদের মা-বাবার নাম উচ্চারণ করতে করতে মরতে চান বরং তারা আল্লাহ-রসূলের নাম জপ করার কথাই বলবেন।

ড. নীলিমা ইব্রাহীম শেখ মুজিবুর রহমানকে যতই ভালবাসেন না কেন, তার প্রতি যতই শ্রদ্ধা রাখুন না কেন, তিনি আল্লাহর একজন বান্দাহ মাত্র। তিনি নীলিমা ইব্রাহীমের দেবতাও নন এবং আখেরে আদালতে কোন মুক্তিদাতা বা শাফায়াতকারীও নন (নাউযুবিল্লাহ)। আমার মনে হয়, শেখ মুজিবুর রহমান জীবিত থাকলে যদি এ কথা শুনতেন, তাহলে এ মহিলাকে তওবা করতে বলতেন। অবশ্য তওবাতে বা আল্লাহ রসূলে এই মহিলার বিশ্বাস আছে কিনা এটাও একটা প্রশ্ন। ড. নীলিমা ইব্রাহীম মৃত্যুকালে শেখ মুজিবুর রহমানের নাম হৃদয়ে ও মুখে জপতে জপতে মরেছেন বলে কোন খবর পাইনি। পত্র-পত্রিকায়ও তেমন কোন কথা ছাপা হয়নি। আল্লাহর নাম তো তার মুখে উচ্চারণও হবে না। তাহলে কি তার একুল-ওকুল দু'কুলই গেল?

ধর্মের ওপরে যাদের কিছুটাও বিশ্বাস আছে, ঈমানের কণা মাত্রও যাদের মধ্যে আছে, তারা সেই বিশ্বাস অনুযায়ী স্রষ্টার নাম নিয়ে মরতে চান। কিন্তু আমাদের দেশের এক শ্রেণীর নরনারীর মৃত্যুকালীন কামনা-বাসনা ভিন্নতর। অবশ্য তারা সংখ্যায় খুব বেশি নয় বরং নগণ্যই বলা যায়। কিন্তু সংখ্যায় নগণ্য হলে কি হবে, তারা নিজ নিজ অবস্থানে গণ্য ও প্রতিষ্ঠিত। তাদের কোন কোন মন্তব্য এ সমাজ দেহে ধাক্কা দেয়। তাদের একজন একবার বললেন, রবীন্দ্র কাব্য চর্চাকে আমি এবাদত মনে করি। তার কাব্য চর্চা হচ্ছে আমার এবাদত। আর একজন বলেছেন, আমার হৃদয়ের আসনে মাত্র একজন বসে আছেন, তিনি রবীন্দ্রনাথ। আর একজন কবির মন্তব্য ছিল এই, আমার হৃদয়ের প্রতিটি স্পন্দনে রবীন্দ্রনাথকে অনুভব করি। বলা বাহুল্য, এই তিনজনই মুসলিম নামধারী, দু'জন মহিলা, একজন পুরুষ। এই তিনজনই আওয়ামী লীগের কট্টর সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও তারা বলেননি যে, শেখ মুজিবুর রহমানকে চর্চা করা তাদের এবাদত, হৃদয়ের আসনে একমাত্র তিনিই বসে আছেন আর হৃদয়ের প্রতিটি স্পন্দনে শেখ মুজিবুর রহমানকে অনুভব করেন। ড.

www.pathagar.com

নীলিমা ইব্রাহীম যদি তার মন্তব্যের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আনতেন, তাহলে তাকে ঐ তিনজনের কাতারে অন্তর্ভুক্ত করে মনে করতাম, তিনি একা নন, তার আগে আরও তিনজন মোটামুটিভাবে একই মন্তব্য করেছেন। তিনি তাদের অনুসরণ করেছেন মাত্র। কিন্তু তিনি তা করলেন না, তিনি এমন কিছু করলেন বা বললেন, যা শুনে শেখ মুজিবুর রহমান কবর থেকে মনে হয় বলছেন, ছি ছি! আমি তো এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী ছিলাম না। আমি তোমাদের কি এমন ক্ষতিটা করেছি যে, তোমরা আমাকে আল্লাহর আসনে বসিয়ে আমার আযাবকে বাড়িয়ে দিয়েছ? এর নাম ভালবাসা নয়, এ শত্রুতা।

আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম এই উপমহাদেশের মধ্যে একমাত্র কবি, যিনি প্রত্যেক ধর্মের ওপর বহু কবিতা ও গান লিখেছেন। তিনি যে সব শ্যামা সঙ্গীত রচনা করেছেন, এমন উঁচুমানের শ্যামা সঙ্গীত খুব কম হিন্দু গীতিকার লিখতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তিনি কেন্দ্রচ্যুত হোননি, কোন সংকীর্ণ গর্তকে তিনি নিজের ভুবন মনে করেননি। মৃত্যুর সময় আল্লাহ ও নবী (সাঃ)-এর নাম জপতে জপতে যেন তার মৃত্যু হয়, এই আকুলতা-ব্যাকুলতা ও কামনা-বাসনা তিনি তার অসংখ্য গান ও কবিতায় নানাভাবে ব্যক্ত করেছেন। তার লাশও সমাহিত হয়েছিল তার অছিয়ত ও নেক-ইচ্ছা অনুযায়ী। তিনি লিখেছিলেন, 'মসজিদেরই পাশে আমার কবর দিও ভাই/যেন গোরে থেকেও মোয়াজ্জিনের আযান শুনতে পাই'।

শুধু এতটুকুর জন্যই মসজিদেরই পাশে তার কবর দেয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেননি।

তিনি বলেছেন, আমার গোরের পাশ দিয়ে ভাই নামাজিরা যাবে/পবিত্র সেই পায়ের ধ্বনি এ বান্দা শুনতে পাবে/গোর আজাব থেকে এ গুনাহগার পাইবে রেহাই/কত পরহেজগার খোদার ভক্ত নবীজীর উম্মত/ঐ মসজিদে করবে ভাই কুরআন তেলাওত/সেই কোরান শুনে যেন আমি পরাণ জুড়াই/কত দরবেশ ফকিররে ভাই মসজিদের আঙিনাতে/আল্লাহর নাম জিকির করে লুকিয়ে গভীর রাতে/আমি তাদের সাথে কেঁদে কেঁদে (আল্লাহর) নাম জপিতে চাই॥

www.pathagar.com

ঈমানের কি দৃঢ়তা ছিল তার। জীবিত থাকতেই তিনি গোরের জীবনকে কিভাবে যাপন করতে চেয়েছেন। এমন ঈমান ক'জন পান? ডক্টর নীলিমা ইব্রাহীম তার রাজনৈতিক নেতার নাম জপ করে মরার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন, নজরুল ইসলাম বলেছেন, শোনো শোনো য়্যা ইলাহি আমার মুনাজাত/তোমারি নাম জপে যেন হৃদয় দিবস-রাত/যেন কানে শুনি সদা তোমারই কালাম হে খোদা/চোখে যেন দেখি শুধু কুরআনের আয়াত/মুখে যেন জপি আমি কলিমা তোমার দিবস-যামী/তোমার মসজিদেরই ঝাড়বর্দার হোক আমার এ হাত/সুখে তুমি আবেহায়াত।

নজরুল ইসলাম শুধু মুখে আল্লাহর নাম জপ করার কথা বলেননি, তিনি শুধু মৃত্যু সময়ের জন্য এই মুনাজাত করেননি, জীবন চলার সব স্তরে আল্লাহর নাম জপ করার, কানে শোনার, দিবস-যামি হৃদয়ে জপ করার মুনাজাত করেছেন। কবির বিবেচনায় এবং তার গ্রহণযোগ্যতার নাগালের মধ্যে অনেক শ্রদ্ধেয় রাজনৈতিক নেতা ছিলেন, কিন্তু তাদের নাম তার ঈমানের সঙ্গে যুক্ত করে মৃত্যু কামনা করেননি।

কবি এক পর্যায়ে ঈমানের গভীর দরিয়ায় ডুব দিয়ে আল্লাহ প্রেমে ব্যাকুল হয়ে আল্লাহর সোহাগ শাসনকে মায়ের সাথে তুলনা করে বলেন, মার কাছে মার খেয়ে শিশু যেমন মাকে ডাকে/ যত দাও দুখ-সুখ, ততই ডাকি তোমাকে।

এবার চিন্তা করে দেখুন, এর চেয়ে গভীর আল্লাহ প্রেম আর কি হতে পারে। তাই তো তিনি নিজের মাকে উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন করছেন, মা গো আমায় শিখাইলি কেন আল্লাহ নাম/জপিলে আর হুঁশ থাকে না, ভুলি সকল কাম। এ জন্য তিনি জীবনের ব্রত হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন আল্লাহর নামের গান গাওয়ার। কাজের মাঝে হাটের পথে, রণ-ভূমে এবাদতে/দেশে দেশে গেয়ে বেড়াই তোমার নামের গান/হে খোদা, এ যে তোমার হুকুম, তোমারই ফরমান।

প্রত্যেক কাজ-কর্মে, খানাপিনায় এমনকি হাটেমাঠে যেতে আল্লাহর নাম নিতে তিনি আমাদের উপদেশ দিয়েছেন। স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে আল্লাহর কাছে সঁপে দিতে বলেছেন, আল্লাহর জিকির করে রাতে ঘুমাতে বলেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি এক

www.pathagar.com

চমৎকার যুক্তি দিয়ে বলেছেন, আল্লাহর নাম শুনে আমরা জন্মেছি, এই নাম নিয়ে যেন মরি। কবির ভাষায় শুনুন, আল্লাহর নাম লইয়া রে ভাই কইরো খানাপিনা/হাটে মাঠে যাইওনা ভাই আল্লাহর নাম বিনা/স্ত্রী-পুত্র-কন্যা তোমার খোদায় সঁপে দিও/আল্লাহর নাম জিকির কইর‍্যা নিশীথে ঘুমিও/(ঐ) নাম শুইন্যা জন্মেছো ভাই, ঐ নাম লইয়া মরিও॥

যারা বৈষয়িক ক্ষুদ্র স্বার্থে আল্লাহর কাছে আশ্রয় না চেয়ে, তার নাম না নিয়ে তার কাছে সাহায্য না চেয়ে অসহায় মানুষের কাছে সহায় চায়, দুনিয়ার ক্ষমতাবানদের তুষ্ট করতে এমন সব কথা বলে যা রীতিমত হাস্যকর, জাতীয় কবি নজরুল ইসলাম তাদের উদ্দেশ্যে বলছেন,

রাজার রাজা বাদশা যিনি,

গোলাম হ' তুই সেই খোদার,

বড়লোকের দুয়ারে তুই

বৃথাই হাত পাতিস নে আর।

(তোর) দুখের বোঝা ভারি হলে

(ফেলে) প্রিয়জনও যায়রে চলে,

(সেদিন) ডাকলে খোদায় তাঁহার রহম

ঝরবে রে তোর মাথার পর॥

যার বা যাদের উদ্দেশে জাতীয় কবির কবিতা ও গান থেকে এত উদ্ধৃতি দিলাম, কে শোনে নজরুলের কথা, তিনি তো 'সাম্প্রদায়িক কবি'। এ মন্তব্য তাদের অর্থাৎ তিনি তো এসব কথা বলবেনই।

হ্যাঁ, তারা এসব মন্তব্য করতে পারেন এবং করেও থাকেন। যিনি অপর সম্প্রদায়ের জন্য এত লেখার পরও এমনকি সেই সম্প্রদায়ের সঙ্গে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও যদি সাম্প্রদায়িক কবি আখ্যায় আখ্যায়িত হোন, তাহলে ওদের মন্তব্যের ওপর মন্তব্য করতে ঘৃণা করে। কবি নজরুল ইসলামের কথা বাদই

www.pathagar.com

দিলাম। কারণ, তিনি তো তাদের ভাষায় 'সাম্প্রদায়িক কবি'। যাকে তারা সেন্ট পার্সেন্ট অসাম্প্রদায়িক কবি বলে থাকেন, যার কবিতা চর্চাকে 'এবাদত' মনে করেন, তার লেখায় আমরা কি পাই? তিনি তো তার স্রষ্টার নাম জীবনে-মরণে সব সময় ডাকার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

তোমারই নাম বলব নানা ছলে

বলব একা বসে, আপন মনের ছায়াতলে।

বলব বিনা ভাষায়

বলব বিনা আশায়

বলব মুখের হাসি দিয়ে

বলব চোখের জলে।

সংসার অরণ্যে পথ হারালে তিনি ঐ নামই ডাকবেন বলে তার গানে বলেছেন।

যদি বনে প্রভু পথ হারাই কভু

তোমারই নাম লয়ে-ডাকিব।

অন্য এক গানে বলেছেন, তোমারই ধ্যানে তোমারই জ্ঞানে তব নামে প্রভু কত মাধুরী

যে ভকত সেই জানে

আর তুমি জানাও যারে

সেই জানে।

তার আর একটি গানের কয়েক ছত্র হলো এই-

আমি দীন হতে দীন

কেমনে শুধিব নাথ হে

www.pathagar.com

তব করুণা ঋণ।

অন্য এক গানে বলেছেন,

আমার মাথা নত করে দাও হে

তোমার চরণধূলার তলে

সকল অহংকার হে আমার

ডুবাও চোখের জলে!

উদ্ধৃতির শেষ গান-

ধায় যেন মোর সকল ভালবাসা/প্রভু, তোমার পানে, তোমার পানে, তোমার পানে/যায় যেন মোর সকল গভীর আশা/প্রভু, তোমার কানে, তোমার কানে, তোমার কানে/ চিত্ত মম যখন যেথা থাকে, সাড়া যেন দেয় সে তত ডাকে/ যদি বাঁধন সব টুটে গো যেন/প্রভু, তোমার টানে, তোমার টানে, তোমার টানে/বাহিরের এই ভিক্ষা-ভরা থালি এবার যেন নিঃশেষ হয় খালি/অন্তর মোর গোপনে যায় ভরে/প্রভু তোমার দানে, তোমার দানে, তোমার দানে/হে বন্ধু মোর, হে অন্তরতম, এ জীবনে যা কিছু সুন্দর/ সকলই আজ বেজে উঠুক সুরে/প্রভু, তোমার গানে, তোমার গানে, তোমার গানে।

শ্রদ্ধেয়া ড. নীলিমা ইব্রাহীম আর এ দুনিয়াতে নেই। তবুও তার উদ্দেশ্যে বলছি, 'অসাম্প্রদায়িক' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তার অনেক গানে আর কবিতায় স্রষ্টার নাম সর্বাবস্থায় জপ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন। এ ক্ষেত্রে নজরুল ইসলামকে অনুসরণ না করলেও রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করা উচিত ছিল। তাহলে ইজ্জতটা অন্তত বাঁচতো। প্রথম ধর্মেও থাকলেন না, দ্বিতীয় ধর্মেও থাকলেন না, আসলে আপনি কোন কুলে অবস্থান নিলেন, সে জবাব নিশ্চয়ই এখন দিচ্ছেন।

www.pathagar.com

ইফতার পার্টি : ইফতার রাজনীতি

যে ইফতার পার্টিতে রোযাদার বেরোযাদার, হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান কোন বাছ-বিচার নেই, শুধু সুনাম আর স্টেটাস হাই করার ব্যাকুলতা আর পাবলিসিটি পাওয়ার কামনা ও আগ্রহ আছে, এসব ইফতার পার্টির পুরোটাই ইফতার রাজনীতি। রোযার ইফতার নিয়ে উপহাস করা মাত্র। বিভিন্ন রাজনীতিবিদ আয়োজিত, রাজনৈতিক দল আয়োজিত এবং রাষ্ট্র আয়োজিত ইফতার পার্টির দিকে অনুগ্রহপূর্বক তাকান এবং খবরাখবর নিন, তাহলে বুঝতে পারবেন ইফতার রাজনীতি কাকে বলে এবং তা কত প্রকার ও কি কি?

www.pathagar.com

রাজনীতি কি? রাজনীতি-বিজ্ঞানের গ্রন্থে এর সংজ্ঞা যা-ই থাক না কেন, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে, বিশেষ করে আমাদের দেশে রাজনীতি এক দুর্বোধ্য শব্দ। যারা রাজনীতিতে বিশেষ স্বাদ পেয়েছেন, তারা রাজনীতি নিয়েই আছেন। তাদের জীবন-জীবিকা, জীবনের লক্ষ্য, গাড়ি-বাড়ি, ধন-দৌলত সবই হচ্ছে রাজনীতি। একবার রাজনীতি ক্ষেত্রে যিনি সুবিধা করে নিতে পারছেন, তিনি সারা জীবন এর সুফল ভোগ করতে পারছেন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আমাদের দেশে রাজনীতি কত প্রকার? রাজনীতি যে কত প্রকার তা বলার সাধ্য আমার নেই। এক ধরনের রাজনীতির তো খবর জানি, সেটা মাঠে-ময়দানে আর পত্র-পত্রিকায় দেখছি; সে রাজনীতির নাম ক্ষমতায় যাওয়া আর ক্ষমতায় টিকে থাকার রাজনীতি। এ রাজনীতি ডানপন্থী রাজনীতি না বামপন্থী রাজনীতি, সেটা ভিন্ন কথা। দেশে যখন বন্যা হয়, তখন এক প্রকার রাজনীতি আমাদের নজরে পড়ে, সেই রাজনীতির নাম বন্যা রাজনীতি। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় দেখা যায় রিলিফ রাজনীতি। এভাবে লক্ষ্য করলে অনেক প্রকার রাজনীতি নজরে পড়বে। তবে পবিত্র রমযান মাসে দেখা যায় ইফতার রাজনীতি। এই রাজনীতি সম্পর্কে কে কতটুকু ওয়াকেফহাল, তা জানি না। তবে ইফতার রাজনীতি আর ঈদ রিইউনিয়ন রাজনীতি এই রাজধানীতে প্রতি বছর রমযান মাসে আর রমযানের পরে জমে ওঠে।

ইফতার রাজনীতিকে জানতে হলে আগে আমাদের জানতে হবে ইফতার কি? ইফতার হচ্ছে রোযাদারের রোযার দিনভর মেয়াদ অন্তে রোযা ভঙ্গের নাস্তা। এ নাস্তা সাধারণ অর্থের নাস্তা নয়, কারো ক্ষুধা নিবৃত্তির নাস্তা নয় অথবা এ নয় কোন শখের বিলাসী ভোজনও। সাধারণভাবে ক্ষুধার্তের আহারও নয় ইফতার। ইফতার হচ্ছে যেমন রোযাদারের প্রথম নাস্তা, তেমনি এ নাস্তা একটি এবাদতও। এবাদত বললাম এ জন্য যে, রোযা ভঙ্গের সময় হওয়ার সাথে সাথে ইফতার করতে হয়, এ হচ্ছে ধর্মেরও তাগিদ।

www.pathagar.com

ইফতারের নিয়ত বলতে আমরা যা জানি এবং যে দোয়া পাঠ করে আমরা ইফতার করি, এই দোয়ার সহজ তরজমা হচ্ছে এই, হে আল্লাহ! আমি তোমারই জন্য রোযা রেখেছিলাম এবং তোমারই দেয়া রুজির ওপর নির্ভর করেছিলাম। এখন তোমারই অনুগ্রহে ইফতার করছি। হে শ্রেষ্ঠ মেহেরবান।

প্রশ্ন হচ্ছে এই, এ দোয়া পড়ে আমরা ইফতার করি অথবা শুধু বিসমিল্লাহ বলেই ইফতার করি না কেন, এই ইফতার কিন্তু একমাত্র রোযাদারদের জন্য। বেরোযাদারের যেমন রোযা নেই, তেমনি তার ইফতারও নেই। রোযাদার বেরোযাদার বাছ-বিচার না করে যখন কোন ব্যক্তি বা দল নিছক আনুষ্ঠানিকতার খাতিরে সামাজিক স্টেটাস হাই করার জন্য বা দলের ইমেজ বৃদ্ধির জন্য ইফতার পার্টির আয়োজন করেন, তিনি বা তারা প্রকৃতপক্ষে ইফতার রাজনীতি করেন। বাছ-বিচারের কথা বললাম এ জন্য যে, ইফতার পার্টি যদি হয় শুধু রোযাদারদের জন্য, তাহলে এই পার্টিতে দাওয়াত করা হবে শুধু রোযাদারদের। তবে নেকনিয়তে যাদের রোযাদার মনে করে দাওয়াত দেয়া হয়, তাদের মধ্যে যদি দু'চার জন বেরোযাদার এসে যান, তাহলে তাতে দাওয়াতকারীর নিয়ত বা কর্মের ওপর কোন মন্তব্য করা যায় না। এ ধরনের ইফতার পার্টিতে কোন রাজনীতি নেই। যেমন ধরুন, বিভিন্ন অফিসে, প্রতিষ্ঠানে বা বাসায় রোযাদার বন্ধু-বান্ধব নিয়ে ইফতারের যে আয়োজন হয়, তাতে রাজনীতির নাম-গন্ধ নেই, শুধু চেনাজানাদের একত্রে বসে ইফতার করা ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য নেই। এমন ইফতার পার্টিতে শুধু যে সামাজিক বোধ আর সম্পর্কই প্রাধান্য পায়, তা নয়, উদ্যোক্তাদের নিয়ত ভাল থাকলে তা এবাদতের পর্যায়েও পড়ে।

এবার আসুন ইফতার রাজনীতি নিয়ে কিছু আলোচনা করা যাক। যে ইফতার পার্টিতে রোযাদার বেরোযাদার, হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান কোন বাছ-বিচার নেই, শুধু সুনাম আর স্টেটাস হাই করার ব্যাকুলতা আর পাবলিসিটি পাওয়ার কামনা ও আগ্রহ আছে, এসব ইফতার পার্টির পুরোটাই ইফতার রাজনীতি। রোযার ইফতারের মর্যাদা ও ইফতার নামের উপহাস করা মাত্র। অনুগ্রহপূর্বক বিভিন্ন রাজনীতিবিদ আয়োজিত, রাজনৈতিক দল আয়োজিত এবং রাষ্ট্র আয়োজিত ইফতার

www.pathagar.com

পার্টির দিকে তাকান এবং খবরাখবর নিন, তাহলে বুঝতে পারবেন ইফতার রাজনীতি কাকে বলে এবং তা কত প্রকার ও কি কি?

থাক সে সব কথা। কে বা কারা কোন নিয়তে ইফতার পার্টির আয়োজন করেন, সেটা তার বা তাদের নিয়তের ব্যাপার। আল্লাহ সে অনুযায়ী রহমত বা লানৎ বর্ষণ করবেন। নিয়তের খবরাখবর একমাত্র তিনিই জানেন যিনি নিয়তেরও স্রষ্টা। ভাল কাজের আয়োজন-আড়ম্বর আর ইন্তেজামের দৃশ্যত ভাল ফিনিশিং হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তার বান্দাহর সব উদ্যোগ আয়োজনকে যে কবুল করে নেন, এমন গ্যারান্টি নেই। নিয়তের গোলমালে সবই আল্লাহ প্রত্যাখ্যান করতে পারেন, এমন আশংকাও উড়িয়ে দেয়া যায় না। এসব হচ্ছে রোযাদারদের ব্যাপার, ইফতার অনুষ্ঠান যদি মুসলমানদের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় অর্থাৎ উদ্যোক্তারা যদি থাকেন রোযাদার আর যারা ইফতারে যোগ দেয়ার জন্য হন আমন্ত্রিত, তাহলে নিয়ত, কবুলিয়ত, রহমত আর লানতের প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। কিন্তু উদ্যোক্তারা যদি হন অমুসলিম আর আমন্ত্রিতরা হন নানা ধর্মের লোক, তারা যদি আসেন ইফতার অনুষ্ঠানে ইফতার খেতে, তাহলে এই ইফতারের মূল্যায়ন কিভাবে হবে? নিয়ত তো অমুসলিম উদ্যোক্তাদের ইসলাম-মনস্ক হতেই পারে না। কারণ, কোন অমুসলিমের দূরতম সম্পর্কও ইফতার, সাহেরী, রোযা, নামায-এর সঙ্গে নেই। এতদসত্ত্বেও তারা যখন ইফতার অনুষ্ঠান করেন, তখন অবশ্যই বুঝতে হবে এসব হচ্ছে তাদের কোন না কোন মতলব হাসিলের নিমিত্ত বা প্রহসন, কৌতুক, রাজনীতি, রাজনৈতিক ধাপ্পাবাজি, হিপোক্রেসি, মুসলমানদের সরল বিশ্বাসকে বিভ্রান্ত করা। এমন ইফতারে যে সব মুসলমান যোগ দেন, প্রথম প্রশ্ন, তারা রোযাদার কিনা, দ্বিতীয় প্রশ্ন সারা দিন রোযা রেখে নিছক শখের বসে বা বিশেষ এলার্জিগ্রস্ত হয়ে অমুসলিমদের দ্বারা আয়োজিত ইফতার পার্টিতে যোগ দেয়ার ধর্মীয় অনুমোদন বা ধর্মীয় বৈধতা কতটুকু? লক্ষণীয়, ইফতার পার্টির আয়োজন করলো যারা, তাদের নেই ইফতারের ওপর কোন ধর্মীয় বিশ্বাস। আমলের প্রশ্ন তো তাদের বেলা উঠতেই পারে না। ইফতার হচ্ছে রোযাদারদের রোযা ভঙ্গের প্রথম আহার, গোটা ব্যাপারই ধর্মীয়, মুসলমানদের ঈমান-আকিদার সাথে

www.pathagar.com

সম্পর্কিত, তাহলে কেমন করে এর আমন্ত্রণকারী ও আমন্ত্রিত অমুসলিম হতে পারে? ইফতার সব সময়ই ইফতার, তা কেমন করে রাজনৈতিক পার্টির মত একটা 'পার্টি' হতে পারে? ইফতার নিয়ে তো কোন পার্টি হতেও পারে না। ফরয রোযা দিনভর পালন করে পৌত্তলিক, মুশরিক, কাফের, খ্রিস্টান, ইহুদীদের আয়োজিত ইফতারের দাওয়াত মুসলমানরা কেমন করে কবুল করতে পারে এবং ইফতার গ্রহণ করতে পারে, তা আমার বুঝে আসে না। ওরা কতটুকু মুসলমান তাতেও আমার সন্দেহ হয়।

কেউ কেউ হয়তো প্রশ্ন করতে পারেন, অমুসলিমরা কেন ইফতারের আয়োজন করে? একমাত্র উত্তর, আমাদের ঈমানের দুর্বলতা তারা জানেন বলে অথবা বলা যায় আমাদের আগ্রহের আগাম সিগন্যাল তারা পান বলে ইফতার পার্টি করেন। আমরা যদি না যেতাম, বলে দিতাম যে, ধন্যবাদ আপনাদের দাওয়াতের জন্য, রোযাদাররা এমন ইফতারে শরীক হতে পারে না। তাহলে আমাদের ঈমান নিয়ে তারা আর টানাটানি করতেন না।

বিচিত্র ইফতার পার্টি : 'অন্য রকম ইফতার মাহফিল, হয়েছে শুক্রবার (২৯/১১/২০০২) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ একই টেবিলে পাশাপাশি বসে ইফতার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক এসএমএ ফায়েজ, নীল ও সাদা দলের শিক্ষক এবং কর্মকর্তাবৃন্দ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসির ক্যাফেতে এ ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। ইফতার মাহফিলে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতৃবৃন্দ ছাড়াও ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রমৈত্রী নেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া সাদা ও নীল দলের সিনিয়র শিক্ষকবৃন্দও অংশগ্রহণ করেন। যে দু'টি ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বক্তৃতার মাঠে একে অপরের বিরুদ্ধে কথা বলতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন না, তারাই সে দিন পাশাপাশি চেয়ারে বসে ইফতার করলেন। হাস্যোজ্জ্বল চেহারা নিয়ে একে অপরের কুশল বিনিময় করেন। এক পর্যায়ে তারা ফটোসেশনে অংশগ্রহণ করেন। ২৯শে নভেম্বরের ইফতার মাহফিলে ছিল না কান ঝালাপালা করা বক্তৃতা। ইফতারীর

www.pathagar.com

কিছুক্ষণ পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ পরিচালক আশরাফ আলী খান মুনাজাত করেন।' -দৈনিক সংগ্রাম।

এ পর্যন্তই খবর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতিকে অসংখ্য ধন্যবাদ দুই বিপরীতমুখী বহমান স্রোতধারাকে একই খাতে কিছুক্ষণের জন্য হলেও প্রবাহিত করতে সক্ষম হলেন। এই অসাধ্য সাধন বাংলাদেশের জন্য রীতিমত এক বিস্ময়। কিন্তু এই ইফতার যদিও কিছুক্ষণের জন্য উভয় সংগঠনের রেষারেষি দমন করতে সক্ষম হয়েছিল, কিন্তু এই নমনীয়তা ঈদের পরও ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। আমার মনে হয়, মিশনের ভিত্তি ইফতার ছিল না, ইফতার নামটাই ছিল। 'ইফতার ইফতার' কৌতুকও বলা যায়।

১৩ই ফেব্রুয়ারি সোমবার ১৯৯৫ সাল। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাও আয়োজিত ইফতার পার্টিতে যোগ দেন সোনিয়া গান্ধী। সোমবারের সন্ধ্যায় নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত সেই ইফতার পার্টিতে বিপুল সংখ্যক অতিথি যোগদান করেছিলেন। হিন্দু-মুসলমানসহ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোক তাতে যোগ দেন। হায়দারাবাদ হাউসে অনুষ্ঠিত ইফতার পার্টিতে যোগ দেন রাষ্ট্রপতি কে আর নারায়ণ, মন্ত্রি পরিষদের সদস্যবৃন্দ, প্রধান বিচারপতি এ এইচ আহমদ, জম্মু-কাশ্মীরের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আবদুল্লাহ, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও ইরানসহ বেশ কিছু কূটনীতিক। সোনিয়া প্রধানমন্ত্রীর পাশে বসেন এবং ঘণ্টা খানেক অবস্থান করেন। বলুন তো, নরসীমা রাও, কে আর নারায়ণ এবং সোনিয়া গান্ধীর সঙ্গে ইফতারের কি সম্পর্ক?

১৯৯৬ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি শুক্রবার ভারতের সাবেক রেল মন্ত্রী সি কে জাফর শরীফের বাসভবনে এক ইফতার পার্টির আয়োজন করা হয়েছিল। লোকসভার স্পিকার শিবরাজ বি পাতিল, সাবেক মন্ত্রী মাধবরাও সিন্দিয়া, বলরাম ঝাকর, কর্ণাটকের গভর্ণর খুরশিদ আলম খান, ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা ড. ফারুক আব্দুল্লাহ, মন্ত্রী রাজেশ পাইলট, আর কে ধাওয়ান এবং সিবতেরীসহ অনেক বিশিষ্ট বক্তি ওই ইফতার পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের রাজনীতির প্রধান দু'নেত্রীকে দেশবাসী কচিৎ কখনো কাছাকাছি দেখেছেন, অর্থাৎ কাছাকাছি দেখেননি প্রায়ই। সেনাকুঞ্জে এক দু'বার কাছাকাছি বসলেও কথা তেমন হয়নি। ১৯৯৩ সালের ৫ই মার্চ শেখ হাসিনার ইফতার পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন খালেদা জিয়া। 'কেমন আছেন ভাল আছি, আপনি কেমন, ভাল আছি' আর কিঞ্চিৎ মুচকি হাসি বিনিময় ছাড়া হৃদয়ের উষ্ণতা বিনিময় হয়নি, রমযানের রোযা তাদের মনের ইবলিসকে দূর করতে পারেনি। খালেদা জিয়ার ইফতার পার্টিতে শেখ হাসিনা কখনো যাননি। মনের উদারতার পার্থক্য এক পক্ষ রেখেই দিলেন।

মার্কিন রাষ্ট্রদূতের ইফতার পার্টি : ২৫শে নভেম্বর ২০০২ সাল। তখন ঢাকাস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূত ছিলেন মেরি অ্যান পিটার্সন। তার দেয়া ইফতার পার্টিতে সরকার ও বিরোধী দলের অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। যে সব রাজনীতিক সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে এক সাথে বসে কথা বলেন না, কুশল বিনিময় করেন না, তারা রীতিমতো চুটিয়ে আড্ডা দিয়েছেন সেই ইফতার নামক কূটনৈতিক নাস্তার টেবিলে। এক কথায় ইফতার পার্টিটি জমেছিল দারুণ। রাষ্ট্রদূতের বাসায় আয়োজিত এই পার্টিতে বিএনপি, বিরোধী দল আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলামীর নেতারা আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। মন্ত্রীবর্গ, বিচারপতি, সেনা কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিকসহ নগরীর গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ হাজির ছিলেন এই পার্টিতে। বর্তমান ও সাবেক দু'অর্থমন্ত্রী অর্থাৎ এম সাইফুর রহমান, শাহ এএমএস কিবরিয়া কুশল বিনিময় করেন একান্তে। আড্ডা যখন জমে উঠেছে, তখনই রাষ্ট্রদূত মেরি অ্যান পিটার্সের গলার স্বর শোনা গেল অপর প্রান্ত থেকে, অবশ্যই মাইক্রোফোনে। তিনি বলছিলেন, তার এই ইফতার পার্টি আয়োজনের নেপথ্য কথা। রমযানের আগে প্রেসিডেন্ট বুশ মুসলিম জাহানের উদ্দেশে যে বাণী দিয়েছিলেন, তাও তিনি উল্লেখ করলেন। বললেন, আমেরিকার জনগণ মুসলিম জনগণকে ভালবাসে, তাদের মতামতকে মূল্য দেয়। আমেরিকার মুসলমানদের জীবনধারা সম্পর্কে জানতে চাইলে 'মুসলিম লাইফ ইন আমেরিকা' ম্যাগাজিনটি পড়ে দেখার তাগিদ জানালেন তিনি। বললেন, দরজার কাছেই

www.pathagar.com

সাজানো রয়েছে ম্যাগাজিনটি। আপনারা যারা দেখতে চান, মুসলমানরা কেমন আছেন, কিভাবে আছেন আমেরিকায়, তাহলে অবশ্যই এই ম্যাগাজিনটি পড়ে দেখবেন। রাষ্ট্রদূত সবাইকে অবাক করে দিলেন মোনাজাতে অংশ নেয়ার আহ্বান জানিয়ে। অবশ্য মোনাজাতটি চমৎকার ইংরেজিতে পরিচালনা করেন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি মোস্তফা কামাল। এর আগে তিনি 'ইসলাম ও রমজান' সম্পর্কে সারগর্ভ আলোচনা করেন, যা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শ্রবণ করেন সকলেই। ইফতার শেষে নামাজের আয়োজন দেখেও অনেকে অবাক হয়েছেন। রাষ্ট্রদূত মেরি অ্যান পিটার্স ও ডেপুটি চিফ অব মিশন ক্রিস্টোফার ওয়েবস্টার অতিথিদের নামাজে অংশ নেয়ার আহ্বান জানান। অনেকেই নামাজে অংশ নেন। এরপর নৈশভোজ ছিল বাড়তি আকর্ষণ। আলোচিত এই ইফতার পার্টিতে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী আবদুল মান্নান ভুঁইয়া, আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এম মোরশেদ খান, সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ, সাবেক মন্ত্রী এমএ জলিল, সাবেক যোগাযোগ মন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জু, যোগাযোগ মন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা, প্রধানমন্ত্রীর সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টা সালাহউদ্দিন কাদের চৌধুরী, কৃষিমন্ত্রী মতিউর রহমান নিজামী, সাবেক পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আবুল হাসান চৌধুরী, ধর্ম প্রতিমন্ত্রী মোশাররফ হোসেন শাহজাহান, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী রিয়াজ রহমান, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব কামাল উদ্দিন সিদ্দিকী, পররাষ্ট্র সচিব শমসের মবিন চৌধুরী, চিফ অব জেনারেল স্টাফ মেজর জেনারেল ইকরাম, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল রুমী, পুলিশের আইজি মোদাব্বির হোসেন চৌধুরী, বিজিএমইএ প্রেসিডেন্ট কুতুব উদ্দিন আহমদ, সাংবাদিক এনায়েত উল্লাহ খান, মাহফুজ আনাম, মতিউর রহমান চৌধুরী প্রমুখ।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ আর পররাষ্ট্রমন্ত্রী কলিন পাওয়েল আমেরিকার নেতৃস্থানীয় মুসলমানদের ইফতার পার্টির আয়োজন করে দাওয়াত করেন। মুসলিম নেতাদের অনেকেই বুশ আর কলিন পাওয়েলের দাওয়াত পেয়ে নিজেরা ধন্য হয়েছেন বলে কৃতজ্ঞতার সাথে মনোভাব প্রকাশ করেন। তাদের অর্থাৎ বুশ-কলিন পাওয়েলদের এই ইফতার পার্টি করার তীব্র ইচ্ছা জাগে আফগানিস্তানে আর ইরাকে

www.pathagar.com

তাদের হামলার সাফল্য ও বিজয় দেখে। জবর দখলের খুশিতে তারা বাগ বাগ হয়ে গরু মেরে জুতা দান করেন। মুসলমানদের মহাক্ষতি করে ইফতার করিয়ে কাটা ঘায়ে সামান্য নুনের ছিটা তারা এভাবেই দিলেন। বোকা মুসলিম নেতাদের ক'জন এই কূটনীতি বা পলিটিক্স বুঝেন? সেটা না হয় হলো, কিন্তু রোযাদাররা রোযা রেখে অমুসলিমদের আয়োজিত ইফতার পার্টিতে যোগ দেয়া কতটুকু শরীয়ত সম্মত, তাতে আমার যথেষ্ট সন্দেহ হয়। আগামী থেকে কি ইফতারের আয়োজনের মত সৌজন্য রোযাও ইহুদী-খ্রিস্টান-পৌত্তলিকরা রেখে দেয়ার ছিলছিলা চালু করে দেবেন? ইফতার তো তারা খাইয়ে দিয়েছেন এবং দিচ্ছেন, বাকি এবাদতও তাদের জিম্মায় ও সৌজন্যে কি হবে? সে দিন যদি কোন দিন আসে, আমাদের পলিটিক্যাল ইসলামী নেতারা বোধহয় আপত্তি করবেন না। তাই তো বুশের ক্রুসেড হলেও ওসামা বিন লাদেনের বা মোল্লা ওমরের ঘোষিত জেহাদ কখনো জেহাদ হয় না।

একদিকে ইফতার নিয়ে কেউ কেউ রাজনীতি করেন আবার কেউ কেউ ইফতারের সাথে বেআদবীও করেন। ইফতারের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন একবার শেখ হাসিনা, যখন তিনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। অবশ্য পরে এই নিষেধাজ্ঞা তুলেও নেন নিজে ইফতারের অনুষ্ঠান করে।

১৯৯৮ সালের ২৩শে ডিসেম্বর পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এক সরকারি নির্দেশনামায় দেখা গেল, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকল সরকারি প্রতিষ্ঠানকে ইফতার মাহফিল আয়োজন করতে নিষেধ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনিও এবার কোনো ইফতার পার্টির আয়োজন করবেন না। বন্যা এবং বন্যা-উত্তর সরকারের কৃচ্ছ্রতা সাধন নীতির দোহাই দিয়েই এ নির্দেশ জারি করা হয়। স্মতর্ব্য যে, ১৯৯৭ সালের রমযানেও প্রচণ্ড শীত ও শৈত্য প্রবাহের অজুহাত দেখিয়ে প্রধানমন্ত্রী ইফতার মাহফিলের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন। পাশাপাশি তিনি জনসাধারণকেও ইফতার মাহফিলে নিরুৎসাহিত করে বলেছিলেন, এ অর্থে দরিদ্রদের মধ্যে বস্ত্র প্রদান করবেন। শীতবস্ত্র যে কি পরিমাণ দেয়া হয়েছে তা অবশ্য পরে আর জানা যায়নি।

www.pathagar.com

যদি কেউ যুক্তি দেখান, এত ভয়াবহ বন্যা হয়ে গেলো, দেশের কিছু পয়সা সাশ্রয় করা দরকার। তাদের বিনয়ের সাথে বলবো, বন্যার পানি শুকানোর আগেই যে ৭০/৮০ কোটি টাকার শ্রাদ্ধ করলেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেট টুর্নামেন্টের নামে! বন্যার্তদের ছোবড়াটা দিয়ে কলাটা যে নিয়ে গেলো আইসিসির ডালমিয়ারা! আন্তর্জাতিক সম্মেলনের জন্য প্রায় ৯০ কোটি টাকার বিলাসবহুল গাড়ি কেনার সময় তো কৃচ্ছ্রতার কথা, বন্যার ক্ষয়ক্ষতির কথা মনে পড়লো না! দলীয় আমদানীকারকদের সুবিধা পাইয়ে দিতে বিশেষ মডেলের গাড়ি চড়ামূল্যে খরিদ করা হলো। ৮০ কোটি টাকার তহবিল তৈরি করা হলো স্বাধীনতা সৌধ নির্মাণের জন্য। নানা দিবস, উৎসব ও বার্ষিকীর টাকায় তো কোনো ঘাটতি দেখা দিলো না। যত অভাব-অভিযোগ আর কিপটেমি সব শুধু ঈমানদার মুসলমানদের ধর্মীয় বিধান পালনে অংশগ্রহণের বেলায়! এমন মানসিকতা কোনো মুসলমানের হতে পারে না। মন্তব্যটি জনাব আহমদ আবু মুসার।

১২ই নভেম্বর, ২০০২ সালের কথা। সোনারগাঁও হোটেলে জামায়াতে ইসলামী আয়োজিত ইফতার পার্টি। দলমত নির্বিশেষে অনেকে ইফতার পার্টিতে শরীক হয়েছিলেন। কিন্তু শরীক হতে পারেননি জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান এবং সাবেক প্রেসিডেন্ট এইচএম এরশাদ। তিন দিন আগে কার্ড পাঠিয়ে এই ইফতার পার্টিতে যোগ দেয়ার জন্য দাওয়াত দেয়া হয়েছিল। জনাব এরশাদ নাকি রওয়ানা হওয়ার সময়ও জনাব মতিউর রহমান নিজামীকে তার আসার ব্যাপারটি কনফার্ম করেছিলেন, জনাব নিজামী তাকে স্বাগতও জানিয়েছিলেন। পথিমধ্যে জনাব কামারুজ্জামান দলীয় কি এক সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে জনাব এরশাদকে দাওয়াতে আসতে নিষেধ করেন। বাধ্য হয়ে এরশাদ সোনারগাঁও না এসে পথেই পানি দিয়ে ইফতার করেন। ১৩ই নভেম্বরের প্রত্যেক জাতীয় দৈনিকে এ ঘটনাটি নানাভাবে সমালোচিত হয়।

যে কোন কারণেই হোক, ইফতারের দাওয়াত দিয়ে এভাবে মোবাইলে দাওয়াত প্রত্যাহার করে নেয়া শরীয়ত সম্মত হয়নি, সামাজিক সৌজন্যবোধ ও

www.pathagar.com

আচরণেরও পরিপন্থী বলেও এ প্রত্যাহারকে গণ্য করা যায়। বাংলাদেশে প্রত্যাহারের ঘটনা দু'টি ঘটে, একটি তো এইমাত্র উল্লেখ করলাম ও দ্বিতীয়টি এডভোকেট হাবিবুর রহমান মণ্ডলের নিহত হওয়ার পর শেখ হাসিনা শোক বাণী পাঠিয়েও প্রত্যাহার করে নেন। শোক বাণী প্রত্যাহারের কারণ ছিল, তিনি প্রথমে শোক বাণী প্রেরণ করেছিলেন নিহত এডভোকেট দল নিরপেক্ষ জেনে। পরে যখন জানতে পারলেন তিনি বিএনপি সমর্থক, তখন শোক বাণী প্রত্যাহার করেন।

জনাব এরশাদ আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই বাধার ব্যাপারে কি চিন্তা-ভাবনা করে দেখেছেন? ইফতারের দাওয়াত পেয়ে তিনি ইফতার পার্টিতে শরীক হতে পারেননি, দেশের প্রেসিডেন্ট এবং সশস্ত্র বাহিনীর সাবেক প্রধান হওয়া সত্ত্বেও ক্যান্টনমেন্টে প্রবেশ অনুমতি পাননি, প্রবেশ গেট থেকে ফেরত আসেন। কেন তিনি বার বার অপমান হন। তার পাপের প্রেসার হয়তো এত বেশি যে, প্রতি বছর দু'-চার বার তার ইজ্জতের ব্লাডার থেকে পাপের বাতাস বের হয়। ব্যবস্থাটা কুদরতী। তার আয়ু শেষ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ঘাটে ঘাটে জিল্লত ভোগের হয়তো ফয়সালা আল্লাহর। তাকে দিয়ে আল্লাহ আন্যদের শিক্ষা দিচ্ছেন, সে শিক্ষা এই, যিনি ইজ্জত দেন তিনি বেইজ্জতও করতে পারেন। পাপের শাস্তি শুধু আখেরাতে নয়, দুনিয়াতেও তার সূচনা ঘটে। জনাব এরশাদের ভীমরতি, অন্যের ঘর ভাঙ্গা এবং সীমাহীন অবৈধ যৌন ক্ষুধার যত্রতত্র নিবৃত্তি তাকে পশুর স্তরেরও নিচে নামিয়েছে। আল্লাহ তাকে এ জন্য হয়তো ঘাটে ঘাটে বেইজ্জত করছে। আরও ভোগান্তি তার সামনে আছে বলে আমি আশংকা করি।

ইফতারের কয়েকটি মডেল পাঠকদের সামনে রাখলাম, এবার চিন্তা করে দেখুন কোনটি রসূল (সাঃ) সমর্থিত বা শরীয়ত সম্মত ইফতার আর কোন্‌টি ইফতারের নামে প্রহসন বা শরীয়ত পরিপন্থী, তা নিশ্চয়ই বাছ-বিচার করে দেখতে পারেন। তবে রোযাদার ছাড়া কোন ব্যক্তিকে ইফতারের দাওয়াত দেয়া বা অমুসলিম আয়োজিত ইফতারে রোযাদারের শরীক হওয়া মোটেই শরীয়ত সম্মত নয়। পরিতাপের বিষয়, নানা কারণে ইফতার আজকাল পলিটিক্যাল ইফতারে পরিণত হতে যাচ্ছে। ইফতার থেকে আমরা এ কারণেই বোধহয় ফায়দা উঠাতে

www.pathagar.com

পারি না। এখনও অনেক বিগ বিগ ব্যক্তি আছেন, যাদের গোটা মাস নিজ গৃহে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ইফতার করার সৌভাগ্য হয় না। আজ এখানে, কাল সেখানে, পরশু অন্যখানে, এভাবে সারা মাস তারা পরের দেয়া ইফতারি খেয়ে মাসটা অতিবাহিত করেন। তারাই আবার বিভিন্ন ইফতার পার্টিতে গিয়ে বক্তৃতা দেন পরিবারের লোকজনকে সঙ্গে নিয়ে ইফতার করার জন্য। এখানেও দেখা যায় কনট্রাস্ট।

এক শ্রেণীর ইফতার পার্টির উদ্যোক্তা আছেন তারা ইফতারের তারিখ ঘোষণা ও কার্ড বিলি করে 'কালেকশনে' বের হন। অর্থাৎ চাঁদা তুলেন। ভিক্ষা করে ইফতার আয়োজন! কি অদ্ভুত কনট্রাস্ট।

আল্লাহ প্রত্যেক রোযাদারকে শরীয়তসম্মত নিয়মে রোযা রাখা ও ইফতার করা ও করানোর তওফিক যেন দেন, আল্লাহর কাছে এই মোনাজাত করি। ইফতার পার্টি যেমন সেক্যুলার হয়ে গেছে অনেকের কাছে, এই অবস্থা দেখে ভয় হয়, আগামীতে সাহরী পার্টির প্রচলন হয় কিনা।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ কাঁপানো কয়েক ঘণ্টা

কত প্রতীক্ষা কত তারিখ, বার বার আগমনের তারিখ পরিবর্তন। তিনি কোথায় থাকবেন, কোন আসনে তাকে বসতে দেয়া হবে, কি খেতে দেয়া হবে, কি বিছানায় শুতে দেয়া হবে, তার চিত্ত-বিনোদনের জন্য কি ব্যবস্থা করা যায়, কোথায় কোথায় তাকে নিয়ে যাওয়া যায় ইত্যাদি হাজারো ভাবনায় সরকার ছিলেন পেরেশান। আগমনের তারিখ বার বার পরিবর্তনের কারণে সর্বশেষ ২০ শে মার্চ (২০০০ সাল) তারিখেও সন্দেহ ছিল। এদিকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর হজে যাওয়ার তারিখ নির্ধারিত। তিনি হজ করতে গেলেন, কিন্তু মাথায় নিয়ে গেলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্টের আগমন চিন্তা। তাড়াহুড়া করে হজের প্রোগ্রামের আনুষ্ঠানিকতা সেরে ১৯শে মার্চই প্রধানমন্ত্রী ঢাকায় ফিরলেন। এদিকে হজ সমাপন, অপরদিকে বিল ক্লিনটনের আগমন, করমর্দন, সবই যথারীতি সমাপন ঘটলো।

www.pathagar.com

আমেরিকান সাংবাদিক জন রীড-এর লেখা 'Ten days that shook the world' একটি বিখ্যাত বই। প্রকাশিত হয় ১৯১৯ সালে। এমন আর একখানা বিখ্যাত পুস্তক হতে পারে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বিল জেফারসন ক্লিনটনের ৬ দিন আমাদের এই উপমহাদেশের ৩টি দেশ সফরের উপর ভিত্তি করে। Six days visit of Clinton in the sub-continent that shook the concerned countries. বিশেষ করে বিল ক্লিনটনের বাংলাদেশ সফরের ওপর একটি চমৎকার বই হতে পারে। 'বাংলাদেশ কাঁপানো ক্লিনটনের ১২ ঘণ্টা' বা 'ক্লিনটনের আগমন বাংলাদেশে ভূকম্পন' অথবা '12 Hrs of visit of Clinton that shook Bangladesh.' বাংলাদেশে অনেক শৌখিন লেখক আছেন, তাদের টাকা-পয়সাও আছে, ইচ্ছা করলে বই লিখে ছাপাতে পারতেন, বিনামূল্যে বিতরণ করতে পারতেন, মজার একখানা বই হতে পারতো। আলোচ্য এ বইতে সে সব ঘটনার আলোচনা থাকতে পারতো, যে সব ঘটনা ক্লিনটনের আগমনে ঘটেছে।

বাংলাদেশে ক্লিনটনের আগমনের সংবাদ বাতাসে অনেকবার ঢেউ তুলেছিল। মৃদু সমীরণ থেকে ঝড়ো হাওয়াও সৃষ্টি হয়েছিল। এই আসবেন এই আসবেন করে পথের দিকে চেয়ে থাকার প্রহর যেন শেষ হয় না। কত প্রতীক্ষা কত তারিখ, বার বার আগমনের তারিখ পরিবর্তন। তিনি কোথায় থাকবেন, কোন আসনে তাকে বসতে দেয়া হবে, কি খেতে দেয়া হবে, কি বিছানায় শুতে দেয়া হবে, তার চিত্ত-বিনোদনের জন্য কি ব্যবস্থা করা যায়, কোথায় কোথায় তাকে নিয়ে যাওয়া যায় ইত্যাদি হাজারো ভাবনায় সরকার ছিলেন পেরেশান। আগমনের তারিখ বার বার পরিবর্তনের কারণে সর্বশেষ ২০ শে মার্চ (২০০০ সাল) তারিখেও সন্দেহ ছিল। এদিকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর হজে যাওয়ার তারিখ নির্ধারিত। তিনি হজ করতে গেলেন, কিন্তু মাথায় নিয়ে গেলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্টের আগমন চিন্তা। তাড়াহুড়া করে হজের প্রোগ্রামের আনুষ্ঠানিকতা সেরে ১৯শে মার্চই প্রধানমন্ত্রী ঢাকায় ফিরলেন। এদিকে হজ সমাপন, অপরদিকে বিল ক্লিনটনের আগমন, করমর্দন, সবই যথারীতি সমাপন ঘটলো।

www.pathagar.com

বিল ক্লিনটন বাংলাদেশ সফরে আসবেন, সে অনেক দিন আগের কথা। হয়তো তিনি অনেক আগেই আসতেন, কিন্তু মধ্যপথে মনিকা এবং অন্যরা গোলমাল বাধিয়ে দিল। ক্লিনটনের চাকরিই যায় যায় অবস্থা। সেই ঝামেলা সারতে এবং আবার মানসিক প্রস্তুতি নিতে সময় লেগে যায় বেশ। তারপর পরিস্থিতি নরমাল হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত এলেন তিনি।

বিল জেফারসন ক্লিনটন কে? তিনি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। একটা স্বাধীন সার্বভৌম ও বর্তমান বিশ্বের এক নম্বর শক্তিধর দেশের প্রেসিডেন্ট। পৃথিবীতে আরও অনেক দেশ আছে, যে সব দেশে স্বাধীন ও সার্বভৌম। পৃথিবীর বহু দেশ আছে, যে সব দেশ আমেরিকার মত এত বড় নয়, এত ধনী নয়, এত শক্তিশালীও নয়। নাই বা হলো বড় দেশ, ধনী দেশ, এত শক্তিশালী দেশ, কিন্তু প্রত্যেক দেশ স্ব স্ব স্থানে স্বাধীন ও সার্বভৌম। মান-মর্যাদার দিক থেকে কোন দেশ ছোট নয়। আত্মমর্যাদাশীল প্রত্যেক দেশ। বড় দেশ হলেই ছোট ছোট দেশ বড় দেশের বড় মিয়াদের তোয়াজ করবে, বড় চেয়ার তাকে পেতে দিয়ে ছোট দেশের প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী মাটিতে আসন পেতে বসবেন, বড় দেশের বড় মিয়াকে সর্বক্ষণ হুজুর হুজুর করতে হবে, এমন কি নিজ দেশে মেহমান হিসাবে এলেও বড় মিয়ার কথা শুনতে হবে, ছোট দেশের নিরাপত্তা তাদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে, এমন নজির বর্তমান বিশ্বে আছে কিনা তা আমি জানি না। আজ আমেরিকা পৃথিবীতে মহাশক্তিধর এবং এক নম্বর শক্তিধর। কিন্তু মাত্র ক'বছর আগেও সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ছিল অগ্রগামী। আজ সোভিয়েত ইউনিয়ন নেই। ইউনিয়ন ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেছে। রাজ্যগুলো স্বাধীন হয়েছে। আজ আমেরিকা যত বড় শক্তিধর, আড়াই শতাব্দী আগেও আমেরিকার কোন পাত্তা ছিল না, মানচিত্রে কোন স্থান ছিল না। তারও আগে রোমান সাম্রাজ্য, পারস্য সাম্রাজ্য সে সময়ের বিচারে বর্তমানের আমেরিকার চেয়েও শক্তিধর ছিল। ওসমানিয়া সাম্রাজ্যের সীমানা ইউরোপের অভ্যন্তর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আজ যে আমেরিকাকে আমরা দেখছি, এই আমেরিকা কেয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত এভাবে একক শক্তিধর থাকবে তা আমরা ভাবতে পারি কেমন করে?

www.pathagar.com

আমেরিকার যে প্রেসিডেন্টকে আমরা এত নতজানু হয়ে আতিথেয়তা করলাম, আফসোস, আমাদের আতিথেয়তা তিনি একটার পর একটা প্রত্যাখ্যান করে বুঝিয়ে দিলেন, আমরা আত্মমর্যাদাশীল জাতি নই। সব ব্যাপারে এত বাড়াবাড়ি করেছি যে, প্রত্যেক বাড়াবাড়ির পদক্ষেপে তার এবং তার সাথীদের সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। তাই তার সামনে যত পরিকল্পনা হাজির করা হয়েছিল সবই তিনি বাদ দিয়েছেন, বাতিল করে দিয়েছেন। আমরা কি ভেবে দেখেছিলাম যে, মাত্র কয়েক মাস পর তিনি প্রেসিডেন্ট থাকবেন না? যখন তিনি প্রেসিডেন্ট থাকবেন না তখন তিনি বাংলাদেশ আসলে কি আমরা তাকে বর্তমানের মত মেহমানদারী করবো? তিনি কি এত লোকজন সমভিব্যহারে বাংলাদেশ সফরে আসতে পারবেন? তখন কি তিনি সিকিউরিটি ফোর্স নিয়ে বিদেশ সফরের অনুমতি পাবেন আমেরিকা সরকার থেকে? যদি তা না হয়, তাহলে কেন আমরা এত বাড়াবাড়ি করলাম? গরিব প্রজার বাড়িতে তার জমিদারের আগমন ঘটলেও এত বাড়াবাড়ি করে না। ভাল একখানা চেয়ার দেয় বসতে, তালের পাখা দিয়ে বাতাস করে, গাছ থেকে ডাব এনে কেটে দেয়। গরিব প্রজা কখনো তার হালের বলদ জবেহ করে জমিদারকে ভোজ দেয় না। আমরা বিল ক্লিনটনকে খুশি করার জন্য যা যা করলাম, তাতে যদি তিনি খুশি হতেন, তাহলে মনে করতাম যে, এত ব্যয় কিছুটা কাজে লেগেছে। কিন্তু তাকে তো খুশি হতে দেখলাম না।

একবার ফরাসি দেশের এক পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমাদের দেশে সরকারি সফরে এসেছিলেন। তখন তার আতিথেয়তা নিয়ে যা করা হয়েছিল, ক্লিনটনের জন্য যা করা হয়েছে তার হাজার ভাগের এক ভাগও নয়, তবুও তিনি উপহাস করে বলেছিলেন, ফরাসি দেশের চেয়ে ব্যাংলাদেশ ধনী দেশ। বিদেশী মেহমানের জন্য বাংলাদেশ যা করতে পারে, ফরাসি দেশের সরকার তা পারে না এবং পারলেও প্রয়োজন আছে বলে মনে করে না।

আত্মমর্যাদাবোধ যে সরকারের মধ্যে সেই, সেই সরকারের পরিচালিত দেশ ও জাতি আত্ম মর্যাদাবোধ অর্জন করতে পারে না। আলেকজান্ডার পুরুর রাজ্য দখল করেন। হুকুম দেন পুরুকে তার সামনে হাজির করতে। আলেকজান্ডার পুরুর

www.pathagar.com

দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার রাজ্য তো আমার দখলে আর তুমিও বন্দি, আমার সামনে হাজির। বলো তো এখন বিজিত রাজা বিজয়ী রাজার কাছে কি ব্যবহার প্রত্যাশা করে। পুরু জানতেন তার সামান্যতম ঔদ্ধত্যের কি পরিণতি হতে পারে। সব জেনে বুঝেই বললেন, আপনি রাজা। দিগ্বিজয়ের লক্ষ্য নিয়ে একের পর এক দেশ জয় করে চলছেন। আমিও ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজা ছিলাম। আপনি বড় রাজা আর আমি ছোট রাজা। কিন্তু উভয়ই আমরা রাজা। রাজার প্রতি রাজার যে ব্যবহার হওয়া উচিত, আমি তেমন ব্যবহার প্রত্যাশা করি। এ কথা বলার পর আলেকজান্ডারের লোকজন পুরুর বেয়াদবী ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথা শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। পুরুকে ধরবার জন্য এগিয়ে আসে। আলেকজান্ডার বাধা দিলেন আর বললেন, পুরু স্পষ্টভাবে সত্য কথাই বলেছেন। আলেকজান্ডার পুরুর রাজ্য পুরুকে ফিরিয়ে দিয়ে স্বদেশের দিকে রওয়ানা হলেন। আত্মমর্যাদার বিজয় ঘোষিত হলো।

আমরা কি হয়ে গেলাম? মুখে তো 'আত্মমর্যাদাশীল জাতির' খৈ ফুটে। মেহমানকে মেহমানদারী করা আমাদের ঐতিহ্য। এ ঐতিহ্য আমাদের সামাজিক ঐতিহ্য, ধর্মীয় ঐতিহ্য। এ ঐতিহ্যকে আমরা কোন দিক দিয়ে হালকা হতে দিতে পারি না। সম্মানিত মেহমান। তাকে ভাল বিছানায় শুতে দেবো, ভাল খাবার খেতে দেবো, ভাল সেবা-যত্ন করবো, মেহমানের কোন দিক দিয়ে কোন ক্ষেত্রে যাতে কোন অসুবিধা না হয় সেদিকে আমরা খেয়াল রাখবো, মেহমানের নিরাপত্তার ব্যাপারে আমরা সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখবো, নিরাপত্তা দানে সব রকমের ব্যবস্থা করবো, এই তো হলো মেহমানের প্রতি আমাদের দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালন করলেই তো মেহমান খুশি থাকেন। এর অধিক আমরা কি করতে পারি? আমাদের দেশের প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী এবং বিভিন্ন মন্ত্রী বিদেশে মেহমান হয়ে যান। তারা কি এমন মেহমানদারী পান, সে অভিজ্ঞতাকে স্মরণ করুন। তাহলেই বুঝতে পারবেন, বাড়াবাড়ি কাহাতক হয়েছে? তারপরও কি খুশি রাখতে বা খুশি করতে আমরা পারলাম ?

www.pathagar.com

১। ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ৭০ লাখ টাকার কীটনাশক ওষুধ আমদানি করে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ভবন ও এলাকা মশকমুক্ত করেছেন, যাতে ক্লিনটনকে মশা বিরক্ত না করে। ক্লিনটনের কয়েক ঘণ্টায় কি এত মশার ওষুধ লাগে?

শুনেছি তাসমিনিয়া থেকে বিশেষ মাছ আনা হয়েছিল, অস্ট্রেলিয়া থেকে বিশেষ জাতের ভেড়ার পিঠের গোশত আনা হয়েছিল ক্লিনটনকে খাওয়ানোর জন্য। এসব তিনি খাননি।

৩। 'মেজর বাডি', বিল ক্লিনটনের খাস কুকুর। প্রেসিডেন্টের সাথেই এসেছিল। শুধু বাডি নয়, আরও কয়েকটি কুকুর তারই সাথে আসে। বাডির জন্য সোনারগাঁয়ে বিশেষ এক স্যুট সংরক্ষিত ছিল। বাডি কি খাবে তার জন্য মেনুও প্রস্তুত ছিল, কিন্তু বাডিকে বাংলাদেশের কোন খাদ্য বা পানিও খাওয়ানো হয়নি। বাডিসহ অন্যান্য কুকুরের খাদ্য আমেরিকা থেকেই আনা হয়েছিল।

৪। বিল ক্লিনটন বাংলাদেশের পানিও নাকি পান করেননি। খাবার পানিও নিজস্ব বিমানে আনা হয়।

বিল ক্লিনটনের নিরাপত্তার জন্য বাংলাদেশ সরকার হেন পদক্ষেপ নেই যা গ্রহণ করেননি। জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ১৫ ঘণ্টার জন্য সকল ফ্লাইট বন্ধ ছিল। এই বন্ধের ঘোষণা আগে দেয়া হয়নি। ২৪টি বিমানের ফ্লাইট বাতিল করা হয় বিনা নোটিশে।

ভিআইপি রোডগুলোতে অঘোষিত কার্ফু ছিল। নজিরবিহীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল মহানগরীর অধিকাংশ এলাকায়। ঢাকা থেকে সাভারে গাজীপুরে এবং গ্রামীণ ব্যাংক এলাকায় অর্থাৎ সর্বত্র ছিল এমন নিরাপত্তা ব্যবস্থা যা গত ৫০/৫২ বছরে ঢাকায় আর কেউ দেখেনি, কিন্তু সবই ব্যর্থ হলো। বিল ক্লিনটনের সিকিউরিটি ফোর্স এই নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যেও দেখেন সন্দেহের ঈদুরের আনাগোনা, বড় বড় বোমা, লাদেন বাহিনী আর মৌলবাদীদের তৎপরতা। বিল ক্লিনটনের সিকিউরিটি

www.pathagar.com

ফোর্স এসব না দেখলেও সরকারই বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন ঈশারায় বুঝিয়ে দিলেন যে, আমরা তো সবই করছি, কিন্তু তবুও সন্দেহ। এই সন্দেহ মোতাবেক কিন্তু অ্যাকশন শুরু হয় দিল্লি থেকে বিল ক্লিনটন ঢাকা অভিমুখে রওয়ানা হওয়ার সময় থেকেই।

যে বিমানে তিনি ঢাকা আসার কথা, তিনি সে বিমানে আসেননি, এসেছেন অন্য বিমানে যার খবর ঢাকা জানে না। কোন্ বিমানে তিনি আছেন, এয়ারপোর্টে যারা আগমন ঘোষণায় ছিলেন তারা পর্যন্ত বার বার বলতে থাকেন প্রেসিডেন্ট কোন্ বিমানে আছেন তা বলা যাচ্ছে না।

এই চমকের পর দ্বিতীয় চমক ছিল এই, তিনি ঢাকায় পৌঁছার কথা ছিল যে সময়ে, কিন্তু পৌঁছেন ১ ঘণ্টারও অধিক বিলম্বে।

পরবর্তী বিপরীত চমক ছিল এই, বিমান থেকে অবতরণের পর গার্ড অব অনার এবং অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে তিনি যে গাড়িতে ওঠার কথা ছিল তাতে উঠেননি, একটি জীপে উঠে বসেন। তারপর একের পর এক নিরাপত্তার প্রশ্নে বিভিন্ন প্রোগ্রাম বাতিল হতে থাকে। তিনি জাতীয় স্মৃতিসৌধে যাননি, যাননি ধামরাইয়ের জয়পুরায়, শেখ মুজিবুর রহমান জাদুঘরেও। নাগরিক সংবর্ধনাও বাতিল হয়ে যায়। একটি দৈনিক প্রশ্ন তুলেছে, কি এমন ঘটেছিল যে, সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধে বা ধামরাইয়ের জয়পুরায় প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের নিরাপত্তা দিতেও বাংলাদেশ ব্যর্থ হয়েছে? বাংলাদেশে এত সৈন্য সামন্ত, মিগ-২১, মিগ-২৯, ফ্রিগেট রাডার, নানা বাহিনী রয়েছে। স্মৃতিসৌধে এলাকাটি খোদ সেনাবাহিনীর নবম পদাতিক ডিভিশনের জিরো রেঞ্জে। তারপরও দুনিয়ায় প্রচার হয়ে গেল প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন নিরাপত্তার কারণে নির্ধারিত কর্মসূচি বাতিল করেছেন।

প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন ঢাকায় আসার কয়েক দিন আগে থেকেই বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন কর্মকর্তা এমন সব কথাবার্তা, সন্দেহ সংশয় সর্বত্র প্রচার করেছিলেন যে, দেশটা মৌলবাদীরা যেন গিলে ফেলেছে। পুলিশের একজন বড় কর্মকর্তার মন্তব্য দেখলাম একটি দৈনিকে। তিনি বলছেন, লাদেন বাহিনীর তিনটি

www.pathagar.com

সংগঠনের ওপর আমরা কড়া নজর রাখছি। এ কথা ক্লিনটনের নিরাপত্তা ফোর্সের কাছে পৌঁছে যায়। বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন সূত্রে তারা এ গুজবও জানতে পারে যে, উলফা গেরিলা পাকিস্তানি পাসপোর্ট নিয়ে ঢাকা এসেছে আর লাদেন বাহিনীতো আছেই। আরো গুজব ছড়ানো হয়েছিল যে, পাকিস্তান থেকে ৪৩টি মিসাইল নিখোঁজ হয়েছে, এগুলো বাংলাদেশে লাদেন বাহিনীর কাছে পৌঁছেছে। এবার বলুন তো এসব কথা যদি প্রচার করা হয়, তাহলে কোন পাগলও নিরাপত্তার প্রশ্নটি উপেক্ষা করতে পারে না। একদিকে এসব প্রচারণা অন্যদিকে নজিরবিহীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা, একি বৈপরীত্যের তামাশা নয়? বামফ্রন্ট মিছিল করলো, বিক্ষোভ প্রদর্শন করলো, তাদের কথা একবারও কোন সরকারি কর্মকর্তা উচ্চারণই করলেন না অথচ মৌলবাদীদের নামে প্রচুর বদনাম রটানো হলো। ব্যাপার কি? রহস্য কোথায় লুকিয়ে থাকে? এত সব প্রচার-প্রপাগান্ডা করার পর বিল ক্লিনটন তো সাহসী পদক্ষেপ নিতে পারেন না। তিনি ঠিক কাজটিই করেছেন, এমনকি ৩২ নম্বর রোডেও ক্লিনটন উঁকি দেননি। একটিবারও বিল ক্লিনটনের মুখ দিয়ে 'বঙ্গবন্ধু জাতির জনক' জাতীয় শব্দ বের হয়নি। বিল ক্লিনটন এসব শব্দের পরিবর্তে বলেছেন 'প্রধানমন্ত্রীর পিতা'। প্রধানমন্ত্রীর একটি অনুরোধও বিল ক্লিনটন রাখেননি। যে অর্থ সাহায্যের কথা বলা হচ্ছে তা নাকি আরও আগে দেয়ার কথা ছিল। ক্লিনটন ঢাকা যাবেন, নিজ মুখে ঘোষণা দেবেন, এ কারণে বিলম্ব ঘটে। বিলম্বেও পাওয়া গেল না, রহস্য কোথায়?

ঢাকায় বিল ক্লিনটনের নিরাপত্তা নিয়ে যা হয়ে গেল তা সাজানো নাটক ছাড়া আর কিছু নয়। এ নাটক সাজিয়ে ছিল বাংলাদেশ সরকার। বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয়ের ২০ পৃষ্ঠার পুস্তিকা 'পলিটিক্স অব বাংলাদেশ, ডেমোক্রেসী ভার্সাস রিলিজিয়াস ফান্ডামেন্টালিজম' বিল ক্লিনটন ঢাকা আসার আগেই আমেরিকা পৌঁছে যায়। ইংরেজি ভাষায় লিখিত এই পুস্তিকা ওয়াশিংটনস্থ হোয়াইট হাউসে, মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরে, মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার কেন্দ্রীয় দফতরে, ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসে এবং এমনকি বিল ক্লিনটনের হাতেও পৌঁছে যায়। শুধু তাই নয়, আমেরিকার সাধারণ নাগরিকের হাতেও নাকি পৌঁছে। এই পুস্তকে আছে ওসামা

www.pathagar.com

বিন লাদেনের বাহিনী নাকি ভীষণ তৎপর বাংলাদেশে। তাদের সাথে যোগাযোগ রয়েছে বিএনপি এবং অন্য বিরোধী দলগুলোর। আর যায় কোথায়, যে বিল ক্লিনটন ওসামা বিন লাদেনের আতংকে সদা থাকেন আতংকিত, তিনি যখন বাংলাদেশ সরকারের লিখিত সাক্ষ্য পাঠ করলেন, তখন ভাবলেন, সর্বনাশ! বিমানে বসেই তিনি একের পর এক কর্মসূচি বাতিল করতে থাকেন। তিনি যে বাংলাদেশ সফর বাতিল করেননি, তাতেও ছিল অন্য পলিটিক্স। এই পুস্তিকাটি লেখা হয়েছে ক্লিনটনের মনটাকে আগাম গঠন করার জন্য, হয়তো এমন একটা বই লিখে ক্লিনটনের সফর শুরুর আগে আমেরিকায় বিতরণের জন্য সিআইএ বা অন্য গোয়েন্দা সংস্থার ইঙ্গিতও ছিল। বাংলাদেশ সরকার ও ক্লিনটন সরকারের মধ্যকার এ এক ড্রামা।

আওয়ামী সরকার হয়তো বলেছিল, আমরা যে বলি বাংলাদেশে মৌলবাদী সন্ত্রাসীদের দৌরাত্ম্য খুব বেশি, খোদ মার্কিন প্রেসিডেন্ট এসে দেখে গেলেন এবং নিজেই বিভিন্ন প্রোগ্রাম বাতিল করলেন। আওয়ামী সরকার এতটুকুই চেয়েছিল, তা পেয়েছে। মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে অপারেশনের মস্ত বড় একটা গ্রাউন্ড পেয়ে যায় আওয়ামী লীগ সরকার। মৌলবাদী দমনের নামে ইসলামের বিরুদ্ধে অপারেশন চালাবে। অপারেশন চালিয়েও ছিল, বিল ক্লিনটনের বাংলাদেশ সফরে আওয়ামী-দর্শনই বেশি লাভবান হয়।

কি যে আজব এক তামাশা আমরা দেখলাম। আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ভাষায় 'বাংলাদেশ একটি উদারনৈতিক মুসলিম সমাজ।' বিল ক্লিনটনের ভাষায় 'বাংলাদেশ ইসলামিক ঐতিহ্যের দেশ।' আর বাংলাদেশ সরকারের ভাষায় বাংলাদেশ ইসলামপন্থী সন্ত্রাসীদের দেশ, বাংলাদেশের বিরোধী দলগুলো আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসীদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে।

নিরাপত্তার দিকটি যে একটা সাজানো নাটক ছিল এবং বিল ক্লিনটনকে দিয়ে এই নাটকের মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করানোর জন্য বাংলাদেশে আনা হয়েছিল সাক্ষী হিসেবে একটা সার্টিফিকেট আদায় করার জন্য, এ প্রমাণ পেলাম ২৬শে মার্চের

www.pathagar.com

একটি জাতীয় দৈনিকে (আওয়ামী সমর্থক) প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে। রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, বাংলাদেশে লাদেন বাহিনী খুঁজে দেখার জন্য গোয়েন্দাদের খুব চাপ দিচ্ছেন সরকার। গোয়েন্দা বাহিনী কঠোর পরিশ্রম করে গোটা দেশ তালাশ করে রিপোর্ট দিয়েছে যে, বাংলাদেশে লাদেন বাহিনীর কোন অস্তিত্বই নেই। গোয়েন্দা রিপোর্টের ওপর সরকারের মন্তব্য হচ্ছে 'রিপোর্ট ঠিক নয়'। আরও গভীরে গিয়ে অনুসন্ধান চালাতে হবে। বিরোধী দলগুলোর মধ্যে ওরা লুকিয়ে থাকতে পারে। সরকার আরও বলেছিলেন, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন নিরাপত্তার অজুহাতে অনেক জায়গায় গেলেন না, তাকি মিথ্যা? ক্লিনটনের খাস গোয়েন্দারা বলেছে, বাংলাদেশে লাদেন বাহিনী আছে। অতএব তোমরা আরও গভীরে তালাশ কর। অর্থাৎ সরকার বলতে চাচ্ছেন, একটা মামলা দাঁড় করাও, সাজাওনা একটা নাটক। সরকার তো পিছনে রয়েছে।

বিল ক্লিনটনের সফরে আওয়ামী সরকারের এটাই নীট প্রোফিট। আমেরিকার শত্রু ওসামা বিন লাদেন, বাংলাদেশের মুসলমানদেরও শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করা হলো আনুষ্ঠানিকভাবে। আমেরিকার এটাই লাভ যা বিল ক্লিনটন বাংলাদেশ সরকারের থেকে আদায় করে নিলেন। এ জন্য আমাদের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বিল ক্লিনটনকে অনুরোধ করেছিলেন, যার সারমর্ম হলো এই, অবৈধ পন্থায় আমার সরকারের যেন পরিবর্তন না হয়, সে ব্যবস্থাটা করে যান। ইঙ্গিত করা হয় হয়তো সামরিক অভ্যুত্থানের দিকে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীই কিছু দিন আগে প্রকাশ্যভাবে বলেছিলেন, বাংলাদেশে আর সামরিক অভ্যুত্থান হবে না, সেই নিশ্চিত আশাবাদ কি এখন আশঙ্কায় পরিণত?

বিল ক্লিনটনের ২০০০ সালের মার্চের কয়েক ঘণ্টার সফর শুধু থ্রিল বা সাসপেন্স নয়, রীতিমত এক ইতিহাস। সে ইতিহাস সুনামের, না দুর্নামের তা ভিন্ন কথা, বিল ক্লিনটনের এ সফরে তাদের চেহারা ধরা পড়েছে স্পষ্টভাবে, শুধু চেহারা নয়, মনের মতলবটাও।

www.pathagar.com

হাইকোর্টের রায় : পতিতাবৃত্তি বৈধ

পতিতা বৃত্তি বৈধ, এ কথার মানে অনেক কিছু। বাংলাদেশে যে কোন মহিলা পতিতা হওয়ার আইনগত অধিকার ভোগ করতে পারবে। সে পতিতা হোক না টানবাজারী পতিতা অথবা সোনারগাঁও স্টেটাসের পতিতা। এই রায়ের ফলে বাংলাদেশের যত্রতত্র পতিতালয় স্থাপনের আইনগত অধিকারও থাকবে যে কোন নাগরিকের। বাংলাদেশে জ্বীনা বৈধ বলে এখন গণ্য হবে। যে কোন বয়সের পুরুষ সিনেমা হলের মত টিকিট ক্রয় করে পতিতালয়ে গমন করতে পারবে। পতিতালয়ের সংখ্যা যত বাড়বে, পতিতার সংখ্যাও বাড়বে, তাদের খদ্দেরদের সংখ্যাও বাড়বে। এই পথ ধরে এইডস, গণোরিয়া এবং সিফিলিস রোগ ব্যাপকভাবে ছড়াবে। পরিবারে দেখা দেবে ভাঙ্গন। বিবাহ ধীরে ধীরে হয়ে যাবে ঐচ্ছিক ব্যাপার। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এই ভাইরাস ছড়িয়ে পড়বে। মোটকথা একটা টেনে আনবে অন্যটিকে। সামান্য জ্বর যেমন অসতর্কতা ও প্রতিরোধ না করার কারণে নিউমোনিয়া বা টাইফয়েড-এর দিকে মোড় নেয়, রোগীকে ভীষণ ভোগায়, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত ঘটায়, হাইকোর্টের এই রায়ও বেনিফিশিয়ারীদের জন্য মহা সুসংবাদ বয়ে এনেছে। যা কেউ কোন দিন শুনবে বলে আশা করেনি, আউলিয়া দরবেশদের এই দেশে, আজ তা সত্য বলে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে।

www.pathagar.com

আলোচনা শেষে পাদটীকা থাকে। এটাই নিয়ম, এটাই রেওয়াজ। আমি এই নিয়ম আর রেওয়াজের উল্টা ধারা প্রবর্তন করে এ আলোচনা শুরু করছি। পাদটীকাটি হচ্ছে এই, ছিনতাই, হাইজ্যাকিং শব্দ দিয়ে ডাকাতিকে যতই জাতে তোলা হোক না কেন, নাম ভিন্ন ভিন্ন হলেও ছিনতাই, হাইজ্যাকিং আর ডাকাতির চরিত্র, খাসলত একই এবং অভিন্ন। জোর করে অন্যের বৈধ সহায়-সম্পদ কেড়ে নেয়াকে যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন, কারবারটা কিন্তু ডাকাতি। নাচনেওয়ালী বা নর্তকীর মাথায় নৃত্যশিল্পী খেতাব সম্বলিত সোনার তাজ দিয়ে রাখলেও নাচই যে মুখ্য, এ ব্যাপারে কোন আগর-মগর নেই। বেশ্যা, পতিতাকে যৌনকর্মী (Sex Worker) বা অপ্সরী, তিলোত্তমা খেতাব দিলেও তাদের কর্মটি যে পর পুরুষকে পয়সার বিনিময়ে দেহদান, নাম আর খেতাব যাই হোক, কর্মটি কিন্তু একই। পশ্চিমা দুনিয়ার অনুকরণ করতে গিয়ে আমাদের হাইকোর্ট পতিতা বেশ্যাদের 'যৌনকর্মী' বলে উচ্চাসন যতই দেন না কেন, পতিতাবৃত্তি, বেশ্যাবৃত্তিই ওদের পেশা। রোগ-জীবাণুর যত সুন্দর নামই রাখা হোক না কেন, রোগ সৃষ্টিই তার কাজ। বিষাক্ত সাপের সামনে দাঁড়িয়ে তাকে যত মধুর সম্বোধন করা হোক না কেন, সুযোগ পেলে সে ছোবল দেবেই, ছোবল দেয়া তার কাজ। উপরোক্ত কথাগুলো হলো আমার এ আলোচনার পাদটীকা। হয়তো কেউ কেউ একে সেন্ট্রাল আইডিয়া বা মর‍্যাল অথবা পটভূমিও বলতে পারেন। তবে আমি বলবো পাদটীকা।

বাংলাদেশে হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি মোহাম্মদ ফজলুল করিম ও বিচারপতি মোহাম্মদ আবদুল ওয়াহাব মিয়ার সমন্বয়ে গঠিত আদালত ১৪ই মার্চ মঙ্গলবার (২০০০ সাল) নারায়ণগঞ্জের টানবাজার ও নিমতলী পতিতাপল্লী উচ্ছেদের (২৩শে জুলাই ১৯৯৯) বিরুদ্ধে পতিতাদের পক্ষে রায় ঘোষণা করেন। এ রায়ের খবর দু'তিনটি ছাড়া প্রত্যেক দৈনিকে প্রায় অভিন্ন শিরোনামে এসেছে। তবে ঢাকার দু'টি দৈনিকে (একটি বাংলা ও একটি ইংরেজি) রায়ের খবরের শিরোনাম আলাদা বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে। তাই দু'টি শিরোনামই উদ্ধৃত করলাম।

১। উচ্ছেদকৃত যৌনকর্মীদের পক্ষে হাইকোর্টের ঐতিহাসিক রায় ॥ আটক

www.pathagar.com

যৌনকর্মীদের অবিলম্বে মুক্তির নির্দেশ ॥ পুলিশ ও প্রশাসনের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার সমালোচনা।

লক্ষণীয় দিকটি হলো এই, প্রথম পৃষ্ঠায় ৪ কলামব্যাপী আকর্ষণীয়ভাবে ছবিসহ উপস্থাপন করা হয়েছে। শিরোনামে 'হাইকোর্টের ঐতিহাসিক রায়' শব্দত্রয় খুব বড় অক্ষরে দেয়া হয়েছে। পত্রিকাটি এ রায়কে খুবই গুরুত্ব দিয়েছে তা শিরোনামের সাইজ দেখেই বোঝা যায়।

২। ইংরেজি দৈনিকটি রায়ের সংবাদ প্রথম পৃষ্ঠায় সিঙ্গেল কলামে ছেপেছে। পত্রিকাটির এই ট্রিটমেন্টে মনে হয়েছে, খুব একটা গুরুত্ব দেয়া হয়নি, তারা একে 'ঐতিহাসিক রায়' মনে করেননি। খবর পরিবেশনের খাতিরে যতদূর দেয়া যায়, তাই দিয়েছেন। এ পত্রিকায় প্রকাশিত খবরের শিরোনাম ছিল এই, HC on Sex Worker : Profession not illegal, their eviction unlawful. রায়ের মন্তব্য দিয়ে শিরোনাম দেয়ার দায়িত্ব পালন করা হয়েছে।

গত ১৪ই মার্চ হাইকোর্টের রায়ের সারকথা হলো, বাংলাদেশে পতিতাবৃত্তি, পতিতালয়, পতিতা রিক্রুট বৈধ। হাইকোর্টের এই রায়ের সাথে পতিতাবৃত্তির বিরুদ্ধে আর কোন বাধা গণ্য হবার নয়। পতিতাবৃত্তি এখন থেকে বাংলাদেশে আইনগত বৈধতার ছাড়পত্র পেল। পুনর্বাসনের লক্ষ্যে সরকার যে সব পতিতাকে আশ্রয় কেন্দ্রে ঠাঁই দিয়েছিলেন, তাদের ছেড়ে দিতে হবে। টানবাজার আর নিমতলীতে তারা ফিরে যাবে। তাদের অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করে এই দুই পতিতালয়ে বরণ করে নেয়া হবে। সে প্রস্তুতি নাকি চলছিল। শুধু জানি না তাদের কিভাবে বরণ করে নেয়া হলো। হাই সোসাইটির যে সব শৌখিন পতিতা অসংঘবদ্ধভাবে এবং বিচ্ছিন্নভাবে কোন কোন হোটেলে-মোটেলে অভিসারে যান, বিভিন্ন উদ্দেশ্যে আগত বিদেশীদের মনোরঞ্জনের জন্য স্বেচ্ছায় বা ভাড়ায় সঙ্গ দেন, তারাও এখন সংঘবদ্ধ হয়ে প্রাতিষ্ঠানিক আইনি স্বীকৃতি পাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করতে পারেন। রেন্ট-এ কার-এর মত তারা ব্যবহৃত হবেন। বাধা আর নেই। তাদেরই হাজার হাজার জন

www.pathagar.com

তো মেয়াদ চুক্তিতে বা স্থায়ীভাবে লিভ টুগেদার করে যাচ্ছেন। শবমেহেরের পর এই পতিতা সংস্কৃতিতে যে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা লেগেছিল, এবার হাইকোর্টের রায়ের ফলে উল্টা আর একটা ধাক্কায় বাধার পাতলা যে পর্দা ছিল, তাও সরে গেল। অবৈধ সন্তানের জন্ম এই জের ধরে আর অবৈধ থাকবে না। অবৈধ যৌন মিলনও আর অবৈধ বলে গণ্য হবে না। সেই সুবাদে ধর্ষণও হয়তো আইনগত ছাড়পত্র পেয়ে যেতে পারে।

পতিতাবৃত্তি বৈধ, এ কথার মানে অনেক কিছু। বাংলাদেশে যে কোন মহিলা পতিতা হওয়ার আইনগত অধিকার ভোগ করতে পারবে। সে পতিতা হোক না টানবাজারী পতিতা অথবা সোনারগাঁও স্টেটাসের পতিতা। এই রায়ের ফলে বাংলাদেশের যত্রতত্র পতিতালয় স্থাপনের আইনগত অধিকারও থাকবে যে কোন নাগরিকের। বাংলাদেশে জ্বীনা বৈধ বলে এখন গণ্য হবে। যে কোন বয়সের পুরুষ সিনেমা হলের মত টিকিট ক্রয় করে পতিতালয়ে গমন করতে পারবে। পতিতালয়ের সংখ্যা যত বাড়বে, পতিতার সংখ্যাও বাড়বে, তাদের খদ্দেরদের সংখ্যাও বাড়বে। এই পথ ধরে এইডস, গণোরিয়া এবং সিফিলিস রোগ ব্যাপকভাবে ছড়াবে। পরিবারে দেখা দেবে ভাঙ্গন। বিবাহ ধীরে ধীরে হয়ে যাবে ঐচ্ছিক ব্যাপার। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এই ভাইরাস ছড়িয়ে পড়বে। মোটকথা, একটা টেনে আনবে অন্যটিকে। সামান্য জ্বর যেমন অসতর্কতা ও প্রতিরোধ না করার কারণে নিউমোনিয়া বা টাইফয়েড-এর দিকে মোড় নেয়, রোগীকে ভীষণ ভোগায়, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত ঘটায়, হাইকোর্টের এই রায়ও বেনিফিশিয়ারীদের জন্য মহা সুসংবাদ বয়ে এনেছে। যা কেউ কোন দিন শুনবে বলে আশা করেননি আউলিয়া দরবেশদের এই দেশে, আজ তা সত্য বলে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছে। ইসলাম বলছে, জ্বীনা হারাম, আইন বলছে জ্বীনা সম্পূর্ণ বৈধ। এ জন্য জ্বীনার বিরুদ্ধে বাংলাদেশে কোন মামলা হয় না। শারমিন হত্যার জন্য মুনীরের ফাঁসি হলো, কিন্তু তার বিরুদ্ধে খুকুকে অবৈধ ভোগ করে যে জ্বীনা কর্মটি বহুদিন চালিয়ে যাচ্ছিল, আইন তাকে এ ব্যাপারে কোন চার্জ করেনি।

www.pathagar.com

আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে মিছিল-মিটিং করা যায় না বলে জানি, যদিও নিকট অতীতে একটি দল কোন কোন রায়ের বিরুদ্ধে মিটিং-মিছিল করেছে, এমনকি হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত বস্তির লোক দিয়ে অবরোধ করে রেখেছিল কয়েক দিন। আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করা যায়, কিন্তু রায়ের ওপর কোন আপত্তিকর মন্তব্য করা যায় না। আমাদের হাইকোর্ট ১৪ই মার্চ পতিতাদের পক্ষে যে রায় দিলেন, সে রায় যাদের বিরুদ্ধে দিলেন তারা আপিল করছেন কিনা তা জানি না।

ব্যাপারটা কিন্তু লাউ-সীম চুরি, গরু চুরি বা ডাকাতি, রাহাজানি বা জমিজমা সংক্রান্ত নয়। হাইকোর্ট যে রায় দিয়েছে তা দু'পক্ষের মধ্যেও সীমাবদ্ধ নয়, এ রায়ের সাথে এ দেশের মুসলমানদের ঈমান-আকিদার প্রশ্ন জড়িত। হাইকোর্টের মাননীয় বিচারকদ্বয় তাদের অবস্থান থেকে প্রচলিত আইন ও প্রবর্তিত রেওয়াজ অনুযায়ী যে রায় দিয়েছেন তা সঠিক। কিন্তু আমি একজন মুসলমান হওয়ায় এই রায় আমার জন্য সংকট সৃষ্টি করেছে। কারণ, সকল রাজার রাজা, আসমান-জমিন ও পাতালের মালিক, বিচারক, সৃষ্টির স্রষ্টা, সকল বিচারকের বিচারক আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আদেশ-নিষেধের পরিপন্থী কোন কিছু মানা যায় না। আল্লাহ পাক জ্বীনাকে হারাম ঘোষণা করেছেন, যারা জ্বীনা করে তাদের নির্মম অবস্থায় মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দিতে বলা হয়েছে। বেত্রাঘাত দ্বারা শাস্তি দান, পাথর নিক্ষেপে হত্যা ইত্যাদি শাস্তি প্রদানের কথা বলা হয়েছে। হাইকোর্টের রায়ে পতিতাবৃত্তিকে বৈধ বলা হচ্ছে। এখন বলুন, মুসলমানরা কোন্ পথে চলবে? দুনিয়ার বিচার মানলে আল্লাহকে হারাবেন, আর আল্লাহর রায় মানলে দুনিয়ার বিচারকের রায় আপনি মানতে পারবেন না অন্তর দিয়ে।

হাইকোর্টের রায়ে পতিতাবৃত্তি বৈধ, আল্লাহর আইনে তা হারাম, জ্বীনা, কবীরা গুনাহ। হাইকোর্টের রায়ে পতিতাদের পতিতাবৃত্তি থেকে সরিয়ে নেয়া মানবাধিকার লংঘন বলা হয়েছে। আর আল্লাহর আইনে তাদের এই ঘৃণ্য বৃত্তি থেকে সরিয়ে নেয়া পুণ্যের কাজ বলা হয়েছে।

www.pathagar.com

হাইকোর্টের রায়ের বিশেষ দিকগুলো পেশ করার আগে বলে রাখা ভাল, ১৯৯৯ সালের ১লা আগস্ট ৫৯টি নারী ও মানবাধিকার সংগঠনের পক্ষে পাঁচটি সংস্থার পাঁচজন নেত্রী ও নেতা যেমন হামিদা হোসেন, এলিনা খান, মাহমুদা মাহমুদ, খায়রুজ্জামান কামাল ও জাহানারা হক হাইকোর্টে একটি রীট পিটিশন দাখিল করেন। তাদের পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন সিগমা হুদা।

হাইকোর্টের রায়ের বিশেষ দিকগুলো হলো এই :

১। পেশা হিসেবে পতিতাবৃত্তিকে স্বীকার করে নেয়া হয়।

২। টানবাজার ও নিমতলী পতিতা পল্লী উচ্ছেদ অবৈধ হয়েছে।

৩। পুলিশের আচরণ বিধির ওপর আইন তৈরির জন্য একাধিকবার বলা হয়েছে অথচ কে শোনে কার কথা।

৪। পতিতাবৃত্তিকে জীবন-জীবিকার প্রশ্নে নির্দিষ্ট এলাকায় সীমাবদ্ধ গণ্ডিতে আবদ্ধ প্রতিষ্ঠিত একটি পেশা হিসেবে স্বীকার করা।

৫। যৌন ব্যবসা কনসেপ্ট হিসেবে সভ্যতার সঙ্গে জড়িত। অনেক ধর্মেও এর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়।

৬। পতিতাবৃত্তি গ্রহণযোগ্য হোক বা ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখা হোক, পেশা হিসেবে স্বীকৃত।

৭। বহু প্রাচীনকাল থেকেই পতিতাবৃত্তির অস্তিত্ব সব সমাজেই রয়েছে।

৮। অনেক দেশের সংবিধানেই এর পক্ষে ও বিপক্ষে বিধান আছে।

৯। পতিতারা এখন যৌনকর্মী হিসেবে স্বীকৃত। বিশ্বের সব দেশেই তারা আছে। বাংলাদেশ এর ব্যতিক্রম নয়।

১০। পতিতালয় হিসেবে বিচ্ছিন্নভাবে হলেও যৌন ব্যবসা সমাজে মিশে আছে।

www.pathagar.com

১১। বাংলাদেশে পতিতাবৃত্তি স্বীকৃত কোন পেশা নয়, কিন্তু তারা যেখানে থাকে সেখানে থাকতে হলে এফিডেভিট করে তাদের সরকারিভাবে তালিকাভুক্ত করা হয়। এর মধ্যদিয়ে তারা এক ধরনের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি পায়। যৌনকর্মী হিসেবে তারা জীবন যাত্রা নির্বাহ করার অধিকার পায়। জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করার অধিকার প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার।

১২। তাদের এই অধিকার রক্ষা করার ক্ষেত্রে সরকার ও প্রশাসনের দায়িত্ব রয়েছে।

১৩। টানবাজার ও নিমতলীতে জীবন ধারণের জন্য যৌনকর্মীরা একটা সীমাবদ্ধ জীবন তৈরি করে। সে অধিকার অবশ্যই তাদের রয়েছে।

১৪। ভোটার হিসেবে তারা তালিকাভুক্ত। ভোটার তালিকায় তাদের পেশা গৃহবধূ ও চাকরিজীবী বা ব্যবসায়ী বা অপর কিছু না লিখে পতিতা উল্লেখ করে পেশা হিসেবে পতিতাবৃত্তিকে স্বীকার করে নেয়ার যে বক্তব্য আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, তাও প্রণিধানযোগ্য।

১৫। যৌন কর্মীদের ভবঘুরে কেন্দ্রে আটক রাখা বেআইনি। পুনর্বাসনের বক্তব্যকে আদালত 'আইওয়াশ' মনে করেন। অবিলম্বে তাদের ছেড়ে দিতে বলা হয়েছে।

হাইকোর্ট রায় দিয়েছে পতিতাদের পক্ষে। পতিতাবৃত্তিকে সরকার-স্বীকৃত ও অনুমোদিত পেশা হিসেবে স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। এ কারণে তাদের এই পেশা চালিয়ে যাওয়ার অধিকারকে আইনি স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। এই আইনী অধিকার বলে তারা টানবাজার ও নিমতলীতে আবার ফিরে আসতে পারবে। সীমাবদ্ধ গণ্ডিতে তারা এই পেশায় নিয়োজিত, এটা নাকি তাদের মৌলিক অধিকার। যৌন ব্যবসা কনসেপ্ট হিসেবে নাকি সভ্যতার সঙ্গে জড়িত। অনেক ধর্মেও এর অস্তিত্ব নাকি খুঁজে পাওয়া যায়। কোন কোন দেশের সংবিধানে স্বীকৃতি রয়েছে। যৌন ব্যবসা বাংলাদেশের সমাজে মিশে আছে। তাদের পেশা মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

www.pathagar.com

এ সব কথা দু'জন মুসলিম বিচারক দেশের প্রচলিত আইন অনুসারেই বলেছেন, তাতে সন্দেহ নেই। পতিতাদের অধিকাংশ মুসলমান, বাদী পক্ষও মুসলমান, এ দেশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ, এ দেশের রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম। মুসলিম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ওআইসির অন্যতম সদস্য। সুতরাং এখানের আইন ও বিধি বিধান, বিচারের দৃষ্টিকোণ, বিশ্লেষণ, উদাহরণ ও ব্যাখ্যা সবই তো মুসলমানদের নৈতিক মূল্যবোধভিত্তিক হওয়া উচিত ছিল। কোন্ ধর্মে পতিতা বৃত্তি স্বীকৃত, কোন্ দেশের সংবিধানে পতিতাদের পক্ষে বিধান রয়েছে, পতিতা বৃত্তির কনসেপ্ট কত প্রাচীন, এ সব যুক্তি পেশ করে পতিতাবৃত্তিকে বাংলাদেশের মত একটি মুসলিম দেশে বৈধতার ছাড়পত্র দেয়ার তো কোন মানে হয় না। বাংলাদেশের শতকরা ৮৫ ভাগ মানুষের দ্বীনী কনসেপ্টের বিরোধী পতিতাবৃত্তি। বাংলাদেশের মুসলমানদের ঈমান-আকিদার সম্পূর্ণ পরিপন্থী পতিতাবৃত্তি। জ্বীনার চেয়েও জঘন্যতম। বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রের বিরোধী। বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রের শিরে লেখা রয়েছে, 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম', প্রস্তাবনার প্রথম প্যারার পরই লেখা আছে Pledging that the high ideals of absolute trust and faith in the Almighty Allah. অর্থাৎ আমাদের অঙ্গীকার সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস। ইংরেজি শব্দ Absolute-এর অর্থ শুধু পূর্ণ নয়, যে পরিপূর্ণতায় কোন সামান্যতম ফাঁক নেই, যাকে বলে নিরঙ্কুশ আস্থা। হাইকোর্টের রায় সংবিধানের এই মৌলনীতির পরিপন্থী, সংবিধান বিরোধী।

আমাদের বিচারকরা অন্যান্য ধর্মের খবর নিলেন, কিন্তু দু'বাহু বাড়িয়ে নিজের দেশের সংবিধান হাতে নিয়ে ভালভাবে দেখলেন না, নিজ ধর্মের শরীয়তের বিধান জানলেন না।

তারা ১১ অনুচ্ছেদ, ১৮ (২) অনুচ্ছেদ ৩১ ও ৩২ অনুচ্ছেদের হাওয়ালা দিলেন, কিন্তু সবই তো সর্বস্তরের মানুষের জন্য, পতিতাদের জন্য খাস করে কিছু লেখা নেই। পতিতাদের ব্যাপারে শুধু ১৮ (২) অনুচ্ছেদে আছে the state shall adopt effective measures to prevent prostitution and gambling. অর্থাৎ পতিতা বৃত্তি ও জুয়া নিরোধের জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

www.pathagar.com

পবিত্র কোরআন এবং হাদীসে এ জঘন্য পেশার ওপর কি কি কথা আছে, কি শাস্তির কথা আছে, কি লানৎ দেয়া হয়েছে, এখানে কোন উদ্ধৃতি দেয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। কারণ, তা হবে উলুবনে মুক্তা ছড়ানোর শামিল। ঝড় আসার আগে প্রকৃতি নীরব হয়, গযব আসার আগেও কি ইসলামপন্থীরা বোবা হয়ে যায়? তবে নিশ্চিত জেনে রাখুন, পতিতাবৃত্তি যখন জীবন-জীবিকার প্রশ্নে মৌলিক অধিকারভুক্ত হলো, আইনী বৈধতা পেল, এই পথ ধরে দু'দিন পর চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানি আইনী বৈধতা পাবে। কারণ, এসব হচ্ছে এক শ্রেণীর মানুষের পেশা, জীবন-জীবিকা। চাঁদাবাজি, অপহরণ, খুন করা, জবর দখল করাও যদি পেশা হিসেবে গণ্য হয়, তাহলে তাও দু'দিন পর আইনে বৈধ বলে ছাড়পত্র পাবে। পেলেই তখন হাইকোর্ট পতিতাবৃত্তির মত বলবে এসব তো জীবন-জীবিকা, পেশা।

যেভাবেই হোক, যে দিক থেকেই হোক, ২০০০ সালের ১৪ই মার্চ বাংলাদেশের জন্য স্মরণীয়, বিশেষ করে পতিতাদের জন্য।

www.pathagar.com

বলশেভিক বিপ্লবে ইহুদী ভূমিকা

[ইসরাঈলের কোন কোন কর্মকর্তা দারুণ মায়াকান্না কেঁদে এ দুঃখ প্রকাশ করেছেন যে, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে ইহুদীরাও ছিল কমিউনিস্ট নির্যাতনের শিকার। তারা ধর্ম-কর্ম করতে পারতো না। সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন ভাঙ্গনের পর্যায়ে, তখন অনেক ইহুদীকে সোভিয়েত থেকে বিতাড়ন করা হয়। ইহুদী নেতারা বুঝাতে চান যে, তারা সোভিয়েত বিপ্লবের ডানে-বামে বা আগে-পিছে ছিলেন না। সত্যি কি তাই? রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সাথে সাথে তারা বোল পাল্টিয়ে ফেলেন। কিন্তু ইতিহাস কি বলে? 'বলশেভিক বিপ্লবে ইহুদীদের ভূমিকা' শিরোনামের এই লেখাটি পড়ুন এবং সত্যকে জানুন।]

www.pathagar.com

ইহুদীরা কমিউনিস্টদের যে কত আপন, তা অনেকেই জানেন না। রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লবে ইহুদীদের অবদান ছিল অপরিসীম।

১৯১৯ সালের ৪ঠা এপ্রিলের Jewish chronicle-এর ভাষ্য : বলশেভিক আন্দোলনের রূঢ় বাস্তবতা হচ্ছে ইহুদীদের সম্পৃক্তি। প্রকৃত কথা হলো এই, অনেক ইহুদীই বলশেভিক। সর্বোপরি যে সাদৃশ্য বলশেভিকবাদ এবং ইহুদীবাদের মধ্যে নিহিত, তা হচ্ছে এই, ইহুদীবাদের ধ্যান-ধারণা আর বলশেভিকদের ধ্যান-ধারণার মধ্যে রয়েছে অপূর্ব মিল।

বোধহয় এ কারণেই রেড আর্মি তার প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করে ইহুদী তারকা। বলশেভিক ক্যুদেতায় ইহুদীদের ভূমিকা কি ছিল, সে সম্পর্কে স্যার উইনস্টন চার্চিল ১৯২০ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারির ইলাসট্রেটেড উইকলি হেরাল্ডে প্রকাশিত একটি লেখায় উল্লেখ করেছেন, লেনিন এক উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। এছাড়া বলশেভিক আন্দোলনের নেতাদের অধিকাংশই ছিলেন ইহুদী। অধিকন্তু ক্ষমতার অদল-বদলের প্রধান মন্ত্রণাদাতাও ছিলেন ইহুদী নেতৃবৃন্দ। কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠাতা কার্লমার্কসের প্রপিতামহ ছিলেন ইহুদী ধর্মযাজক। তার নাম ছিল Mordeccai। কার্লমার্কস নামটিও ইহুদী Moses-Hess-এর নামানুসারে রাখা হয়। কমিউনিজমের অন্যতম প্রাণ পুরুষ ফ্রেডারিক এঙ্গেলসকে কমিউনিজমে দীক্ষা দেন হেস। হেস ছিলেন একজন অতি ধনাঢ্য টেক্সটাইল ম্যাগনেট, যিনি মার্কসকে অর্থ যোগান দিতেন।

১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসে বলশেভিকরা যখন মস্কো ও পেটিসবার্গের স্বল্পায়ু গণতান্ত্রিক সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে, তখন সেটা ছিল প্রকৃতপক্ষে ইহুদী ক্যুদেতা। বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ইহুদী প্রতিনিধি ছিলেন ট্রটস্কি। তার আসল নাম ছিল ব্রনসটেইন (Bronstein)। তিনি বিবাহ করেন ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে এক ইহুদী শাস্ত্র বিশেষজ্ঞ মহিলাকে। তিনি যখন নিউইয়র্কে নির্বাসন জীবন-যাপন করছিলেন, তখন

www.pathagar.com

তিনি Novymir-এর পক্ষে কাজ করতেন। ২৩/১/১৯২৫ তারিখের 'চার্জ টাইমস' সংখ্যায় এ কথার উল্লেখ আছে। শুধু তাই নয়, বলশেভিক বিপ্লবের সময় যে সব সাংবাদিক ও কূটনীতিক ছিলেন সোভিয়েত রাশিয়ায় উপস্থিত, তারাও এই বিপ্লবে ইহুদী প্রাধান্যের সাক্ষ্য দিয়েছেন। 'গার্ডিয়ান' প্রতিনিধির বিধবা স্ত্রী মিসেস আরিয়ান্দা তিরকোভা উইলিয়াম (Mrs. Arianda Tyrkoya Willams) লিখেছেন, সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের সকল কমিটি এবং কমিশারীর প্রত্যেকটি পদ ছিল ইহুদী প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিপূর্ণ। বলশেভিক বিপ্লবে ইহুদী প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন তৎকালীন টাইমসের রাশিয়ান করোসপন্ডেন্ট রবার্ট উইলটন। তিনি ১৯২০ সালে LES DERNIERS JOURS DES ROMANOFS নামে ফরাসি ভাষায় একটি বই প্রকাশ করেন। তিনি তার পুস্তকে সোভিয়েত সরকারের সকল সদস্যের জাতিগত পরিচিতি তুলে ধরেন। এই পুস্তকটির ইংরেজি অনুবাদ অজ্ঞাত কারণে প্রকাশিত হয়নি। যা হোক, এই পুস্তক প্রকাশিত হওয়ার পর গ্রন্থকার উইলটনকে প্রেস বয়কট করে। তিনি ১৯২৫ সালে অভাব-অনটনের দিন যাপন করে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি তার পুস্তকে বলশেভিক কেন্দ্রীয় কমিটির ধর্মভিত্তিক জাতীয়তার যে পরিচিতি দিয়েছেন তা এখানে পেশ করা হচ্ছে।

নাম	জাতীয়তা
ব্রনস্টেইন (ট্রটস্কি)	ইহুদী
অ্যাপফেল বাউম (জিনোভীফ)	"
লুরী (লেরিন)	"
আওরিস্কি	"
ভলোদারস্কি	"
রসেন ফেলদ (কামেনেফ)	"

www.pathagar.com

স্মিদভিচ	”
সারদলফ (ইয়াংকেল)	”
নাকামকেস (স্টেকলফ)	”
উলিয়ানভ (লেনিন)	রাশিয়ান
ক্রাইলেনকো	”
লাওনাচারস্কি	”

দি কাউন্সিল অব দি পিপলস কমিশারস গঠিত হয় নিম্নোক্ত সদস্য নিয়ে।

মিনিট্রি	নাম	জাতীয়তা
প্রেসিডেন্ট	উলিয়ানড (লেনিন)	রাশিয়ান
ফরেন এফেয়ার্স	চিচেরাইন (Tchitcherine)	”
ন্যাশনালিটিজ	জুগাশভিলি (DJUGASHVILI)	জর্জিয়ান
কৃষি	প্রোটিয়ান	আর্মেনিয়ান
অর্থনৈতিক পরিষদ	লুরী (লেরিন)	ইহুদী
খাদ্য	স্লিকটার (Schlichter)	”
আর্মি এবং নেভী	ব্রনসটেইন (ট্রটস্কি)	”
স্টেট কনট্রোল	ল্যানডার	”
রাষ্ট্র ও ভূমি প্রশাসন	কাওফম্যান	”
ওয়ার্কস	ভি, শীমিদ	”
সোশ্যাল রিলিফ	ই, লিলিনা (Kingissen) মহিলা	”

www.pathagar.com

পাবলিক ইনস্ট্রাকশন	লওনচারস্কি	রাশিয়া
ধর্ম বিষয়ক	স্পীজবার্গ	ইহুদী
আভ্যন্তরীণ	অ্যাপফেল বাউম (Zinoviel)	"
হাইজিন	অ্যানভেল্ট	"
ফাইন্যান্স	ইজিদর গাওকভস্কি	"
প্রেস	ভলোদারস্কি	"
ইলেকশনস	আওরস্কি	"
জাস্টিস	আই স্টেইনবার্গ	"
শরণার্থী	ফেনিংস্টাইন	"
শরণার্থী (সহকারী)	সেভিচ	"
শরণার্থী (সহকারী)	জাসলোভস্কি	"

বলশেভিক কেন্দ্রীয় কমিটিতে এবং কাউন্সিল অব দি পিপলস কমিশারে ইহুদীদের প্রাধান্য যে ছিল শুধু তাই নয়, অন্যান্য কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটিগুলোতেও ছিল ইহুদীদের সংখ্যাধিক্য এবং একচ্ছত্র প্রভাব। নিম্নোক্ত তালিকার দিকে লক্ষ্য করলে যে কোন পাঠক এ কথা ভাবতে বাধ্য হবেন যে, সোভিয়েত রাশিয়ার বলশেভিক আন্দোলন মানেই ইহুদীদের আন্দোলন।

কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটিতে যে সব সদস্য ছিলেন তাদের পরিচিতি হচ্ছে এই-

সেভার্দলফ (প্রেসিডেন্ট)	ইহুদী
এভানেসসফ (সেক্রেটারি) আর্মেনিয়ান	ইহুদী
ক্রনো	(লেট, লাটভিয়ার অধিবাসী)

www.pathagar.com

ব্রেসলাউ	ইহুদী
বাবচিনস্কি	রাশিয়ান
বুখারিন	ইহুদী
ওয়েনবার্গ	”
গাইলিস	”
গাঞ্জবার্গ	”
ডানিচেভস্কি	জার্মান
স্টার্ক	ইহুদী
সাকচস	”
চীনম্যান	”
ইয়াদলিঙ্গ	”
ল্যান্ডাউর	”
লিন্ডার	চেক
ওলাচ	-
ডিমানস্টেইন	ইহুদী
ইনককাইজ	জর্জিয়ান
হরম্যান	ইহুদী
জফি	”
কার্কলাইন	”

www.pathagar.com

নিজিসস্যান	”
রসেন ফেলদ (কেমেনেফা)	”
এপফেল বাউম (জিনোভীফ)	”
ক্রাইলেঙ্ক	রাশিয়ান
ক্রসিকফ	ইহুদী
কেপরিক	”
কাওউল	লেট
উলিয়ানভ (লেনিন)	রাশিয়ান
লাটসিস	ইহুদী
ল্যান্ডার	”
লওনাচারস্কি	রাশিয়ান
পেটারসন	লেট
পেটারস	”
রইজুটাস	ইহুদী
রজিন	”
স্মিদভিচ	”
স্টাউচকা	লেট
নাকামকেস (স্টেকলফ)	ইহুদী
সসনভস্কি	”

www.pathagar.com

স্ক্রাইটনক	”
ব্রনস্টেইন (ট্রটস্কি)	”
থিওডরবিচ	”
টেরিয়ান	আর্মেনিয়ান
আওয়ারস্কি	ইহুদী
টেলেচকাইন	রাশিয়ান
ফেলদম্যান	ইহুদী
ফ্রমকাইন	”
সউরিটপা	উক্রাইনিয়ান
চেবচেভেজ	জর্জিয়ান
চেকম্যান	ইহুদী
রসেনটেল	”
আচকিনাজি	ইমেরেটিয়ান
কারাকেইন	কারাইম
রোজ	ইহুদী
সবেলসন (রাদেক)	”
স্লিচার	”
চিকোলিনী	”
চিকিরালনস্কি	”

www.pathagar.com

লভেইন (প্রাভদাইন) ”

মস্কোর এক্সট্রা অর্ডিনারী কমিশারের তালিকা হচ্ছে নিম্নরূপ :

নাম	জাতীয়তা
জেরৈনস্কি (প্রেসিডেন্ট)	পল
পেটারস (ভাইস প্রেসিডেন্ট)	লেট
চকলোভস্কি	ইহুদী
কেইফিস	”
জেইসটাইন	”
রাজমিরভিচ	”
রণবার্গ	”
খাইকিনা	ইহুদী মহিলা
কার্লসন	লেট
চাউমান	ইহুদী
লিয়ন্টভিচ	”
জ্যাকব গোল্ডাইন	”
গালপার স্টেইন	”
নিজিসিন	”
লাজিস	লেট
চিলেস্কাস	ইহুদী

www.pathagar.com

জেনসন	লেট
রিভকাইন	ইহুদী
এন্টনফ	রাশিয়ান
ডেলফাব্রি	ইহুদী
সিকাইন	”
রসকিরভিচ	”
জি, ভার্দলিফ	”
বাইসেসকি	”
ব্লিউমকাইন	”
আলেকজান্দেভিচ	রাশিয়ান
আই মডেল	ইহুদী
রউটেনবার্গ	”
পাইনস	”
সাচস	”
ডেবল	লেট
সেইসউন	আর্মেনিয়ান
ডেলকেনেন	লেট
লাইবার্ট	ইহুদী
ভগেল	জার্মান
জাকিস	লেট

www.pathagar.com

যদিও লেনিন 'রাশিয়ান' বলে পরিচিত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তার জাতীয়তাবাদ পাঁচ-মিশালী। এক অংশ রাশিয়ান, এক অংশ জার্মান, এক অংশ ইহুদী এবং এক অংশ কালমাক (মঙ্গল)। তার চেহারাও তাই প্রমাণ করে। তার স্ত্রী নাজেদা ক্রুপস্কিয়া ছিলেন ইহুদী। স্বগৃহে তিনি ইদিস (ইহুদী) ভাষায় কথা বলতেন।

১৯১৮ সালে ব্রিটিশ সরকারের কাছে সেন্ট পিটার্সবার্গ থেকে ডাচ কন্সাল মিঃ অদেনডাইক (**Mr. Oudendyke**) একটি রিপোর্ট প্রেরণ করেন। এই রিপোর্টে বলা হয়, বলশেভিক আন্দোলন ইহুদীদের দ্বারাই সংগঠিত এবং তা সক্রিয়ভাবে কার্যকরও রাখে ইহুদীরা। ব্রিটিশ সরকার পুস্তিকা আকারে রিপোর্টটি প্রকাশ করে ১৯১৯ সালের এপ্রিল মাসে সরকারি এক শ্বেতপত্র হিসাবে। এই শ্বেতপত্রের নাম দেয়া হয় Russia no. 1 (1919) A collection of Reports on Bolshevism in Russia. শ্বেতপত্র প্রকাশের পর পরই তা প্রত্যাহার করে নিয়ে আবার এই রিপোর্ট অনেক কিছু রদবদল করে প্রকাশ করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় মহাফেজখানায় যুদ্ধ রেকর্ড বিভাগের ফাইলে একটি রিপোর্ট আছে। এ রিপোর্টটি সেন্ট পিটার্সবার্গে কর্মরত আমেরিকান গোয়েন্দাদের সংগ্রহ। আমেরিকান যুদ্ধাভিযান বাহিনীর রেকর্ড গ্রুপ-২০-এ আছে জি ২ গোয়েন্দা দলের অধিনায়ক ক্যাপ্টেন মন্টেগোমারী সুইলের (Montgomery Schuyler) লিখিত রেকর্ড, তাতে তিনি লিখেছেন, বলশেভিক আন্দোলনের সৃষ্টি, বিকাশ, প্রসার এবং এর নিয়ন্ত্রণ মুলে রয়েছে রাশিয়ান ইহুদী। যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় মহাফেজখানায় আরো দুটি টেলিগ্রাম রয়েছে। এই দু'টি টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন রাশিয়ায় কর্মরত আমেরিকার ডিপ্লোমেটরা। ২রা মে ১৯১৮ সালে আমেরিকান কনসাল মস্কো থেকে যে দলিলপত্র প্রেরণ করেন, তার নম্বর হচ্ছে ৮৬১.০০/১৭৫৭। এতে উল্লেখ আছে, 'সোভিয়েতের স্থানীয় সরকারেও ইহুদীদের ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য; তবে ইহুদী বিরোধী বিক্ষোভ বৃদ্ধি পেতে দেখা যাচ্ছে।' ৫ই জুলাই, ১৯১৮ ব্লাদিভস্টক থেকে কনসাল কান্দওয়েল যে তথ্য প্রেরণ করেন, সেই তথ্য দলিলের নম্বর হচ্ছে ৮৬১.০০/২২০৫। তাতেও যে কথার উল্লেখ আছে, তা হচ্ছে এই—

www.pathagar.com

'সোভিয়েতের প্রত্যেক শহরে সরকারি শহর কমিটির শতকরা ৫০ ভাগ সদস্য হচ্ছে ইহুদী এবং সেসব ইহুদী, যারা মন্দ চরিত্র সম্পন্ন।'

১৯২৪ সালের জানুয়ারি মাসে লেনিন মারা যান। তার মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে যে সব তথ্য পাওয়া যায়, তা হচ্ছে এই, 'হার্ট অ্যাটাক' 'মস্তিস্কে রক্তক্ষরণ' এবং 'সিফিলিস'। লেনিন মৃত্যু শয্যায় থাকতেই তার কমরেডরা ক্ষমতা দখলের লড়াই শুরু করেন। যোশেফ স্টালিন ক্ষমতা দখল করেন লেনিনের কট্টর সমর্থকদের নির্বাসনে পাঠিয়ে এবং অনেককে হত্যা করে। স্টালিন যদিও ইহুদী ছিলেন না, কিন্তু সেমিটিক বিরোধী তো অবশ্যই ছিলেন। তার ছিল তিন স্ত্রী। এই তিনজনই ছিলেন ইহুদী। প্রথম স্ত্রী ইকাটেরিনা সে ভেনিজ (EKATERINA SVANIDZE)। তার গর্ভে স্টালিনের এক পুত্র সন্তান জন্ম নেয়। তার নাম ছিল জাকব (JACOB)। তার দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম ছিল কাদিয়া এলি ভিজাহ (Kadya Alle Vijah) এই স্ত্রীর গর্ভে স্টালিনের এক ছেলে ও এক মেয়ে জন্ম নেয়। ছেলের নাম ভাসিলি (Vassili) এবং মেয়ের নাম সেভেতলানা (Svetlana), দ্বিতীয় স্ত্রীর মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে দুটি মতই প্রধান। কেউ কেউ বলছেন, তিনি আত্মহত্যা করেন। বিপরীত মত হচ্ছে এই, স্টালিন তাকে হত্যা করেন। তবে এ কথা সত্য যে, হত্যার মতই প্রবল। স্টালিনের তৃতীয় স্ত্রী ছিলেন রোসা কাগানভিচ। তিনি ছিলেন সোভিয়েত শিল্প প্রধান মিঃ লাজার কাগানভিচের বোন। স্টালিনের মেয়ে ১৯৬৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রে পালিয়ে গিয়ে লাজারের ছেলে মিহাইলকে (mehail) অর্থাৎ তার সৎ মার ভাইয়ের ছেলেকে বিয়ে করেন। সেভেতলানার মোট চারজন স্বামী ছিল, তন্মধ্যে তিনজন ছিল ইহুদী। স্টালিনের ভাইস প্রেসিডেন্ট মলটভও ইহুদী মেয়ে বিয়ে করেন। মলটভের মেয়ের নামও ছিল সেভেতলানা, স্টালিনের ছেলে ভাসিলিকে বিয়ের জন্য সেভেতলানা মানসিক দিক দিয়ে সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলেন বলে জানা যায়।

স্টালিনের মৃত্যুর পরও এই ট্রাডিশন তার উত্তরাধিকারগণ রক্ষা করে চলেন।

www.pathagar.com

Bnai B'rth measenger পত্রিকার এক রিপোর্টে উল্লেখ আছে, 'রাশিয়া সব সময় ইহুদীদের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ছিল এবং তাদের সাথে ভাল ব্যবহারই করে, শুধু এ প্রমাণ দেয়ার জন্য একটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়, একবার নিকিতা ক্রুশ্চেভ পোলিশ দূতাবাসে অনুষ্ঠিত এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে যে মন্তব্য করেন, তাহলো এই : শুধু আমি এবং সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট (Klementi Varoshla নই, সোভিয়েত প্রেসিডিয়ামের অর্ধেক সদস্যের রয়েছে ইহুদী স্ত্রী। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন ইসরাইলি অ্যামবেসেডার যোশেফ এভিদার। তাকে লক্ষ্য করে ক্রুশ্চেভ বলেন, ক্রুশ্চেভের স্ত্রীও আর এক কাগানভিচ।

লিওনিদ ব্রেজনেভ-এর স্ত্রী ছিলেন ইহুদী। শুধু তাই নয়, তার সন্তানেরা ইহুদী রীতি-কৃষ্টি অনুযায়ী লালিত-পালিত। এ তথ্য পরিবেশন করেছে The Canadian Jewish News (১৩/১১/৬৪)। সোভিয়েত সরকারে ইহুদী প্রাধান্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সোভিয়েত শিল্প ব্যবস্থাপনার প্রধান ছিলেন দিমিত্রি ডাইমসিটস। লেভ সাপিরো ছিলেন বিরোবিজানের রিজিওনাল সেক্রেটারি; আর ইউরি অ্যানড্রভ ছিলেন কেজিবি-এর গুপ্ত পুলিশ প্রধান। এভাবে সোভিয়েতের গোপন ও প্রকাশ্য সর্বক্ষেত্রে ইহুদীদের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান ছিল। সোভিয়েতের প্রশাসনিক ইতিহাসও এ সাক্ষ্য দেয় যে, Uritsky থেকে Beria, সবই ইহুদী। সোভিয়েত অর্থ ব্যবস্থার প্রধান লিওনিদ কানটরোভিচও ছিলেন ইহুদী। এ কথাও মোটেই অজ্ঞাত নয় যে, বলশেভিক আন্দোলনের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করতো পশ্চিমা ইহুদী ধনকুবেরগণ।

১৯১৭ সালের ২৩ শে মার্চ রাতে নিউইয়র্কের কার্নেগী হলে অনুষ্ঠিত হয় বলশেভিক র‍্যালি অনুষ্ঠান। এ অনুষ্ঠানে লোইব এন্ড কোম্পানির জেকোব শীফ অব কুন-এর একটি টেলিগ্রাম পাঠ করে শুনানো হয়। টেলিগ্রামটি পর দিনের নিউইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত হয়। অবশ্য তিনি এই টেলিগ্রামের সাথে তার সম্পৃক্তির

www.pathagar.com

ব্যাপারটি অস্বীকার করেন। এই ব্রালি অনুষ্ঠানের ৩০ বছর পর তারই দৌহিত্র জন স্বীকার করেন, এই বুড়ো ২০ মিলিয়ন ডলার বলশেভিকদের জন্যই ব্যয় করেন।

স্টকহোম-এর অন্য একজন পশ্চিমা ব্যাংকার, তার নাম ছিল ওলাফ অ্যাশবার্গ। তিনি রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লবে প্রচুর অর্থ যোগান দিতেন। ১৯৪০-এর দশক পর্যন্ত তিনি ছিলেন সোভিয়েতের পে-মাস্টার। ৬ই ডিসেম্বর ১৯৪৮ সংখ্যা লন্ডন ইভিনিং স্টার অ্যাশবার্গের সুইজারল্যান্ড সফর সম্পর্কে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়।

এই রিপোর্টে উল্লেখ আছে, 'অ্যাশবার্গ সুইস সরকারি কর্মকর্তা এবং ব্যাংক কর্মকর্তাদের সঙ্গে গোপন বৈঠক করেন। কূটনৈতিক মহল উল্লেখ করেন, মি. অ্যাশবার্গ 'সোভিয়েত ব্যাংকার' হিসাবে ছিলেন পরিচিত। তিনি ১৯১৭ সালে লেনিন এবং ট্রটস্কিকে মোটা অংকের অর্থ প্রদান করেন। বিপ্লবের সময় মিঃ অ্যাশবার্গ ট্রটস্কিকে রেড আর্মির ইউনিট গঠনের জন্যও বিপুল পরিমাণ অর্থ দেন।'

বলশেভিকরা আরমান্ড হ্যামার থেকেও প্রচুর অর্থ সাহায্য পায়। তিনি নিউইয়র্ক এবং মস্কোর মধ্যকার ব্যবসা স্বার্থের লিয়াজোঁ রক্ষা করতেন। দক্ষিণ রাশিয়ার ১৬০০ মাইল কেমিক্যাল পাইপ লাইন নির্মিত হয় হ্যামারের অক্সিডেন্টাল অয়েল কোম্পানির সহযোগিতায়।

১৯১৯ সালে হাঙ্গেরীতে কমিউনিস্ট বিপ্লব ঘটে। এ বিপ্লবের মূলে ছিলেন ইহুদী বেলা কুন (কোহেন)। বিপ্লবের তিন মাসের মধ্যে হাঙ্গেরীতে দেখা দেয় ভীষণ অরাজকতা। আবার ওলট-পালট ঘটে। নতুন সরকার গঠিত হয়, তাও আবার ইহুদীদের দ্বারা। সে সরকারেরও পতন ঘটে। কুন পালিয়ে যান সোভিয়েত ইউনিয়নে। সেখানে গিয়ে তিনি দক্ষিণ রাশিয়ার গুপ্ত পুলিশ চিকা-এর প্রধান হয়ে যান। জার্মানিতে তো ইহুদীরা ভীষণ উৎপাত শুরু করে। তাদের এই উৎপাত উপদ্রবই প্রথম মহাযুদ্ধের প্রধান কারণ হিসাবে ধরে নেয়া যায়। সোভিয়েত

www.pathagar.com

অ্যামবেসেডর জফি এবং রোসা লুক্সেমবার্গ, জার্মান সরকারকে উৎখাত করার ষড়যন্ত্র করেন, কিন্তু ব্যর্থ হন। ফলে লুক্সেমবার্গ এবং কার্ল লিম্বনেচকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

রোমানিয়ার যুদ্ধোত্তর ডিক্টেটর আন্না পাউকার ছিলেন বুখারেস্টের এক কসাই কন্যা। এক সময় তিনি হিব্রু ভাষার শিক্ষিকা ছিলেন। এই আয় দিয়েই তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন। তার বাবা ও ভাই ইসরাঈলে বাস করেন। একমাত্র টিটোকে বলা যায়, তিনি ইহুদী ছিলেন না। কিন্তু টিটোর মন্ত্রণাদাতা ছিলেন একজন ইহুদী, তার নাম মূসা পিজাদী। চেকোশ্লোভাকিয়ায় মস্কোর যে পুতুল সরকার ছিল, তাও অন্য এক ইহুদী রুডলফ স্লানস্কি দ্বারা পরিচালিত হতো। পোল্যান্ডের প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন ছিল ইহুদী কর্মকর্তা। তাদের মধ্যে মিস্ক, ক্রাইওয়েস্কি, মজেলস্কি এবং বারমানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গোমুলকার স্ত্রী ছিলেন ইহুদী। চীনের সেনাবাহিনীতেও ছিলেন দু'জন ইহুদী। একজনের নাম ছিল লেভিচেভ এবং অন্যজন ছিলেন জেবি গামারনিক।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেও ইহুদী প্রাধান্য ছিল। যুদ্ধমন্ত্রী ছিলেন হোর বেলিশা। আজকের জেবরাক্রসিং তারই উদ্ভাবিত পারাপার সংকেত।

বেরণ সেইন্সবারী খাদ্য মন্ত্রণালয়ের যুদ্ধকালীন কনসালটেটিভ কমিটিতে কাজ করেছেন। তিনি ১৯৬২ সালে মারা যান। ১৯৩৯ সালে তিনি খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অনারারী ক্যাটারিং অ্যাডভাইজার ছিলেন। যুদ্ধের সময় তিনি দেশের ইমার্জেন্সী ফিডিংয়ের কনটিজেন্সী প্লানস-এর পরিকল্পনায় দায়িত্বশীল ছিলেন।

লর্ড নাথান ছিলেন আঞ্চলিক সৈন্যবাহিনীর রিক্রুটিং ক্যামপেইনের সংগঠক। উইম্যান সার্ভিস ছিল লেডি রিডিংয়ের নেতৃত্বে। হামবার্ট ওলফ ন্যাশনাল সার্ভিস হ্যান্ডবুক সংকলিত করেন। ১৯৪০-৪৭ সাল পর্যন্ত ছিলেন স্যার বার্ণাড ওয়েলে

www.pathagar.com

কোহেন জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের এক বিশিষ্ট কর্মকর্তা। স্যার রিচার্ড জেসেন অর্থনৈতিক ওয়ারফেয়ার-এর অধীনে কর্মরত ছিলেন। যুদ্ধের বছরগুলোতে প্রফেসর লুইস রোসেন হেড সরবরাহ মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন। ১৯৪৫ সালে জে এ ডি রথচাইল্ড সরবরাহ মন্ত্রণালয়ের জয়েন্ট সেক্রেটারি হয়েছিলেন। যুদ্ধ শুরুর সময়ে ছিলেন তিনি রেগুলেশন ১৮ বি-এর অধীন সর্বময় কর্তা ব্যক্তি। জর্জ স্টাউজ ছিলেন ভাক্সলের শ্রম এমপি। ১৯৪২ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন এয়ারক্রাফট উৎপাদন মন্ত্রী। স্যার বেন লক স্পাইজার ছিলেন এই বিভাগের তত্ত্বাবধায়ক। প্রফেসর মসেস ব্লাকম্যান ছিলেন আণবিক গবেষণা কেন্দ্রে কর্মরত। এই বিভাগটি ছিল হোম সিকিউরিটির অধীনে। ফিল্ম প্রোপাগান্ডা ছিল সিডনে বার্ণস্টে (তখন লর্ড বার্ণস্টেইন)-এর নিয়ন্ত্রণে। ইশা বার্লিন ছিলেন ওয়াশিংটনস্থ ব্রিটিশ দূতাবাসের লিয়াজোঁ অফিসার।

যুদ্ধের পর মস্কোতে অবস্থিত ব্রিটিশ দূতাবাসে এই দায়িত্ব পালন করেন। প্রফেসর অ্যাডওয়ার্ড উলেন ডরফ ছিলেন তৎকালীন সময়ে ইরিত্রিয়াতে সেন্সর এবং তথ্য ইনচার্জ হিসাবে। ড. মার্ক বরামস ছিলেন সাইকোলজিক্যাল এয়ারফেয়ার বোর্ডের সদস্য। রিচার্ড বার্নেট ছিলেন ইন্টেলিজেন্স অফিসার। প্রফেসর বার্ণাড লিউজও তাই ছিলেন। প্রফেসর লিওনার্ড সাপিরো ছিলেন বিবিসি-এর মনিটরিং সার্ভিসে। ব্যারন ম্যান, ফ্রেমেন্ট ফ্রেউড (লিবারেল এমপি), এল লুবিন ই, সমারসটেইন, বার ডেভিড ওয়েলে এবং এ রুয়েফ-এদের প্রত্যেকেই ছিলেন ইহুদী। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে তারা কর্মরত ছিলেন এবং রাশিয়ার স্বার্তেই কাজ করেছেন।

গোয়েন্দা বৃত্তি : পশ্চিমা দেশে কমিউনিস্ট এজেন্টদের অধিকাংশই ছিল ইহুদী। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, কেজিবি তার জন্মের শুরুতে যেমন ছিল ইহুদী

www.pathagar.com

প্রভাবাধীন, তেমনি তার দীর্ঘ পথ-পরিক্রমার শেষ অবধি ছিল ইহুদী প্রাধান্য। ১৯৪৫ সালে এফবিআই মেরেশিয়া ম্যাগাজিনের সাথে সংশ্লিষ্ট ৬ জনকে গ্রেফতার করে। তারা স্টেট ডিপার্টমেন্টের ফাইল থেকে ১৭০০ অতি মূল্যবান দলিল চুরি করে। এই ৬ জনের মধ্যে ৩ জন ছিল ইহুদী। তারা হলেন ফিলিপ মাফি, এন্ড্রু রথ এবং মার্কগাইন (জুলিয়াস গিনসবার্গ)।

১৯৪৯ সালের জুন মাসে রুদিত রুপলিন নামের এক ইহুদী মহিলা ধরা পড়ে। জাতিসংঘে কর্মরত এক রাশিয়ান এজেন্টকে এই ইহুদী মহিলা অনেক দলিল হস্তান্তর করার সময় হাতেনাতে ধরা পড়ে এবং গ্রেফতার হয়। এ অপরাধের জন্য তার ১৫ বছরের জেল হয়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে এ আদেশ নাকচ হয়ে যায়। কারণ, তাকে ওয়ারেন্ট ইস্যু ছাড়া গ্রেফতার করা হয়েছিল।

গেরহার্ড আইসলার ছিলেন শীর্ষ স্থানীয় কমিউনিস্ট নেতা। ১৯৩৫ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন মার্কিন কমিউনিস্ট পার্টির গুপ্ত প্রধান। তার দক্ষিণহস্ত ছিলেন অন্য একজন ইহুদী। তিনি পেটারস নামে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু তার প্রকৃত নাম ছিল মোল্ড বার্গার। ১৯৫০ সালের মে মাসে জামিনে মুক্তি লাভ করে আইসলার আমেরিকা থেকে পালিয়ে পোলান্ডের জাহাজ স্টিফেন ব্যাটরিতে গিয়ে উঠেন। তিনি পূর্ব জার্মান সরকারের অধীনে চাকরি নেন।

১৯৪৯ সালে কাউস ফুচস নামক নাজী জার্মানীর এক নাগরিককে ব্রিটিশ গোয়েন্দা বাহিনীর লোক গ্রেফতার করে। তাকে পরে ব্রিটিশ নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়। ফুচ ছিলেন একজন কমিউনিস্ট। ধৃত হওয়ার পর তার জবানবন্দি এবং প্রাপ্ত দলিলপত্র বিশ্লেষণ করে কর্তারা নিশ্চিত হয়েছিলেন যে, ফুচস পাক্কা কমিউনিস্ট; কিন্তু তার এই পরিচিতি ও প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও অজ্ঞাত কারণে তার কদর বেড়ে

www.pathagar.com

যায়। নিউমেক্সিকোর আমেরিকার আণবিক প্লান্টে ব্রিটিশ স্টাডি গ্রুপে তিনি অন্যতম সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হন। শুধু তাই নয়, আলবার্ট আইনস্টাইনের মত ব্যক্তিত্বের অভিভাবকত্ব লাভের সৌভাগ্যও অর্জন করেন। যা হোক, পরবর্তী সময়ে তিনি গোয়েন্দা বৃত্তির অভিযোগে অভিযুক্ত হন এবং ১৪ বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

হ্যারি গোল্ড (গলডডনস্কি) ছিলেন সোভিয়েতের আণবিক গোয়েন্দা বিভাগের একজন বিশিষ্ট গোয়েন্দা। তিনিও একই অভিযোগে ৩০ বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। জুলিয়াস এবং ইথেল রোজেনবার্গ ১৯৫৩ সালের জুন মাসে সিংসিংগে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। ইথেল রোজেনবার্গের ভাই ডেভিড গ্রীন গ্লাস আণবিক প্রকল্পে কাজ করতেন। তিনিও ১৫ বছরের কারাদণ্ড ভোগ করেন। মটুন সোবেল রাডার গোপনীয়তা রোজেনবার্গে পাচার করার অভিযোগে ৩০ বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

আব্রাহাম ব্রাদারম্যান, মিরিয়াম মসকোউয়িজ এবং সিডনি ওইনবাউম গোয়েন্দাগিরির অভিযোগে অভিযুক্ত হন। মাথা দধ স্টার্ন এবং তার স্বামী একটা অকাণ্ড ঘটিয়ে এফবিআই-এর দৃষ্টি ফাঁকি দিয়ে প্রাগে পালিয়ে যান। অন্য দম্পতি জেন এবং জর্জ ট্রটস্কি সালভস্কি কাজ করতেন সিআইএ এবং আমেরিকার গোয়েন্দা বিভাগে। তারা পালিয়ে গিয়ে প্যারিসে রাজনৈতিক আশ্রয় গ্রহণ করেন।

জ্যাক এবং মাইরা সোবল খুব একটা ভাগ্যবান ছিলেন না। ম্যাক সোবলের প্রকৃত নাম ছিল আব্রমোস সোবালভিসা। তিনি ছিলেন লিথুয়ানার বিশিষ্ট ব্যবসায়ীর পুত্র। তিনি গোয়েন্দাগিরির জন্য যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৪১ সালে চলে আসেন। ড. রবার্ট সোবলেন (জ্যাক সোবলের ভাই), বরিস মরোস (একজন হলিউড ফিল্ম প্রোডিউসার) এবং জ্যাকব এলবাম, এরা সবাই ছিলেন ইহুদী।

জ্যাক সোবল-এর সাত বছর কারাদণ্ড হয়। তিনি প্রায় এক ডজন নাট-বল্টু গলাধঃকরণ করে আত্মহত্যার ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলেন। তার স্ত্রী মাইরা সাড়ে চার

www.pathagar.com

বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। জ্যাকব এলবামের ৫ বছরের জেল হয়েছিল। ড. রবার্ট সোবলেনও মামলায় জড়িয়ে পড়েন। জামিনে মুক্তি পেয়ে তিনি ইসরাঈলে পালিয়ে যান। অনেক ঘটনার নায়ক ছিলেন তিনি। পলায়ন ঘটনার এক সপ্তাহ পর তিনি মারা যান। ১৯৫৭ সালে আমেরিকানদের হাতে একজন কেজিবি কর্নেল ধরা পড়েন। তিনি ছিলেন সোভিয়েত গোয়েন্দা অপারেশনের এক প্রাণপুরুষ। কর্নেল রুদোলফ এবেল ব্রুকলেনে বাস করতেন এমিল আর গোল্ডফাস ডাক নামে। এবেল অতি সহজেই সক্ষম হয়েছিলেন অন্য এক ইহুদী গোয়েন্দা দম্পতিকে বশীভূত করতে। সেই দম্পতির নাম ছিল মরিস এবং লোনা কোহেন। কিন্তু নাটকীয়ভাবে তারা পৃথিবী থেকে চিরতরে হারিয়ে যান। তারা পোর্টল্যান্ডে সাবমেরিন স্টেশনে গুপ্ত খবর পাঠাতেন। তাদের প্রেরিত খবর গ্রহণ করতেন হুটন এবং ইথেল ঘি।

১৯৬২ সালে এবেল এবং গে পাওয়ার-এর বিনিময় হয় সোভিয়েত রাশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে। ব্রিটিশ সরকার মলোডি এবং গ্রেভাই উইল-এর মধ্যে বন্দী বিনিময় করে।

সোভিয়েতের পক্ষে ইহুদীদের গোয়েন্দাগিরির বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো হ্যারি ডেক্সটার হোয়াইট-এর যুক্তরাষ্ট্রের সরকারে অনুপ্রবেশ এবং তার দৃঢ় অবস্থান। তিনি হেনরী মরগেনথাউ-এর অধীনে যুক্তরাষ্ট্রে ট্রেজারীর সহকারী সেক্রেটারি পর্যন্ত হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, মি. হোয়াইট সোভিয়েতের একজন বিশ্বস্ত গোয়েন্দা হয়ে চৌর্যবৃত্তিতেও ঝানু ব্যক্তি হিসাবে নিজেকে প্রমাণ করেন। তিনি মার্কিন মুদ্রার খোদাই করা প্লেট এবং স্পেশাল প্রিন্টিং পেপার সোভিয়েতের জন্য পূর্ব জার্মানীতে পাচার করেন। মজার ব্যাপার হলো এই, এফবিআই যখন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানকে এই ব্যক্তিটির অপকর্ম এবং সন্দেহজনক গতিবিধি সম্পর্কে অবিহত করে, তখন ট্রুম্যান কি জানি কেন এই ব্যক্তিটির ব্যাপারে কোন তদন্ত না

www.pathagar.com

করে বরং তাকে আন্তর্জাতিক মনিটারী ফান্ডের প্রধান হিসাবে প্রমোশন দেন। এই দায়িত্ব পেয়ে তিনি মনিটারী ফান্ডের সদ্ব্যবহার করেন। পোল্যান্ডের সরকারকে (সোভিয়েতের পুতুল সরকার) তিনি অঢেল অর্থ যোগান দেন।

আর একটি ঘটনা বৃটেনে রীতিমত ঝড় তোলে। জর্জ ব্লেইক (প্রকৃত নাম বেহার) এই ঝড় সৃষ্টির মূল ব্যক্তি। তার জন্ম রোটেরডামে অতি ধনাঢ্য মিসরীয় ইহুদী মার্চেন্ট পরিবারে। মহাযুদ্ধের সময় তিনি বৃটেনে আসেন এবং চাকরি নেন বৃটেনের ফরেন অফিসে। অতি শিগগিরই তিনি এম-১৬ বিভাগে এক গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হন। এই সুবিধাজনক পদ লাভ করার পর তিনি গোটা ব্রিটিশ নেটওয়ার্কের যাবতীয় দলিল সোভিয়েতের কাছে বিক্রি করে ফেলেন। অবশ্য তিনি পরে ধরা পড়েন। তার বিচার হয়। ৪২ বছর তিনি কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। কিন্তু পাঁচ বছর কারাভোগের পর তিনি এক আইরিশের সহায়তায় জেল থেকে পালাতে সক্ষম হন এবং মস্কো চলে যান। আইরিশ ব্যক্তিটিও স্বদেশে চলে যায়।

ইতালিতে জন্মগ্রহণকারী প্রফেসর ব্রুনো গনটেকরভো ছিলেন বৈজ্ঞানিক এবং ইহুদী সন্তান। মি. ফুচসের মত ছিল তার গোয়েন্দা কার্যক্রম। অ্যাংলো কানাডিয়ান এটমিক রিসার্চ প্রকল্পে ছিল তার কার্যক্রম। প্রথমে তিনি ছিলেন একজন শরণার্থী হিসাবে, এই ছিল তার পরিচয়। ধীরে ধীরে তিনি নিজের জায়গা করে নেন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে। তিনি কানাডার চক রিভার হেভী ওয়াটার প্রকল্পে কমিউনিস্ট বৈজ্ঞানিক ড. নানমে-এর অধীনে কাজ করেন। কিছুদিন পর তিনি এবং তার পরিবার কানাডা থেকে পালিয়ে যান। এ ঘটনা ঘটে ১৯৫০ সালে। পরে জানা গেল, তিনি ইতালিতে চলে গেছেন। ১৯৬৩ সালে পনটেক-রভো লেনিন পুরস্কারে ভূষিত হন। সোভিয়েতের 'পদার্থ বিজ্ঞানে মহান অবদান' ছিল এই পুরস্কার লাভের মূল ভিত্তি। নানমে কানাডায় কর্মরত ছিলেন ৬ বছর। এই দুই বৈজ্ঞানিক কানাডায়

www.pathagar.com

ছিলেন সোভিয়েত গোয়েন্দা নেটওয়ার্কের অধীনে। শ্যামকার, ফ্রেড রোজ, ইরা অ্যাডাম, ডেভিড শুগার, এইচ এস গারসন, জেএস রেন্নিং ইসরাঈল হালপারিন, ফ্রেডা লিন্টন, এসএস বারমন, হেনরী হ্যারিস এবং জেইসিদর গোথিল-এদের প্রত্যেকেই ছিলেন ইহুদী কমিউনিস্ট।

অনেক কুখ্যাত ইহুদী অপরাধী ছিল অতীতে, তারা আজও আছে, কিন্তু কদাচিৎ অপরাধ বিজ্ঞানীরা তাদের নিয়ে আলোচনা করেন। অর্থাৎ প্রায়ই করেন না। কেন করেন না, তা তারাই ভাল জানেন। কুখ্যাত ইহুদী অপরাধীদের কুখ্যাতি যত দিন ব্যাপকভাবে জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে না পড়ে, ততদিন ইহুদী অপরাধ বিজ্ঞানী এবং ঐতিহাসিকরা নিজেদের অপরাধীদের অপরাধ গোপনই রাখেন।

১৯৭৫ সালে প্রকাশিত হয় চেইম বারমেন্ট-এর লেখা একখানা বই, যার নাম 'পয়েন্ট অব এরাইভ্যাল।' এই পুস্তকে জ্যাক দি রীপার সম্পর্কে বলা হয়েছে, সে একজন মামুলী খুনী, ইহুদী ধর্মের প্রতি তার রয়েছে প্রগাঢ় অনুরাগ এবং তাকে ধর্মান্ধও বলা যায়। এসিস্টেন্ট পুলিশ কমিশনার এই লোকটি সম্পর্কে বলেছিলেন, 'সে ছিল এক পল ইহুদী, আমি শুধু প্রতিষ্ঠিত সত্যকে নিশ্চিতভাবে ব্যক্ত করেছি।' লোকটি ১৯৮৮ সালের শরৎকালে লন্ডনের পূর্ব সীমান্তে কমপক্ষে ৫ জন পতিতাকে হত্যা করে। কিন্তু বারমেন্ট বলেন, প্রত্যেকটি খুনের ঘটনা ঘটেছে ইহুদীদের শোক দিবসে। কোন গটনায়ই খুনিকে চাক্ষুস দেখা যায়নি। সুতরাং জ্যাক দি রীপারই যে খুনি, তা প্রমাণিত হয় না। মোট কথা, ইহুদী দাগী অপরাধীদের সাফাই এভাবেই গাওয়া হয়।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইস্টএন্ড (বিশেষ ককর হোয়াইট চ্যাপেল) ছিল পূর্ব ইউরোপের ইহুদী বিপ্লবী এবং সন্ত্রাসীদের মিলন কেন্দ্র। ১৯১০ সালে তিনজন পুলিশকে হত্যা করা হয়। এই হত্যাকাণ্ডটি ঘটায় পেটার দি পেইন্টারের নেতৃত্বাধীন

www.pathagar.com

ইহুদী দুর্বৃত্ত দল। পেটার দি পেইন্টারের প্রকৃত নাম ছিল পেটার পিয়াতকো। তিনি মাইর নামক স্থানের শেষ প্রান্তে সন্ত্রাসী ক্লাবের সিনারী পেইন্টার হিসাবে কাজ করতেন। স্বরাষ্ট্র সেক্রেটারি উইনস্টন চার্চিলের তত্ত্বাবধানে গার্ড এবং পুলিশের বড় একটি দল সিডনী স্ট্রিটে একদল সশস্ত্র দুর্বৃত্তকে পাকড়াও করে। গৃহটি অগ্নিদগ্ধ হয়। কিন্তু দুর্বৃত্তদের রিং লিডারকে পাওয়া যায়নি। এই রিং লিডার ছিল ইহুদী। সে কিভাবে পালিয়ে গেল তাও কেউ জানে না।

বর্তমান বিশ্বে বিশ্ববাসীকে হতচকিত করিয়ে দেয়ার মত যত অপরাধমূলক ঘটনা ঘটছে, প্রায় সবগুলোর মূল নায়ক ইহুদী। 'গিনিজ বুক অব রেকর্ডস'ও বলে, বিশ্বের সবচেয়ে সুসংগঠিত অপরাধ সিন্ডিকেট হচ্ছে মাফিয়া অথবা কসা নস্ট্রা, যা হচ্ছে একটি সিসিলিয়ান ইহুদী চক্র শক্তি। এই মাফিয়ার প্রধান হচ্ছে মেয়ার লান্সকি। মাফিয়া চক্রের চেয়েও ভয়ংকর খুনি চক্রের সংস্থা হলো 'মার্ডার ইন করপোরেইটেড'। এই সংস্থার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যতজন জড়িয়ে আছেন তাদের প্রত্যেকে ইহুদী। এই সংস্থাটি ব্রুকলিনের গ্রীন পয়েন্ট ডিস্ট্রিক্টভিত্তিক। এ সংস্থার নেতা হলেন লুইস 'LEPKE' বুচাল্টার। এদের বৈশিষ্ট্য হলো, বিচালি দিয়ে বেঁধে শিকারকে আইসপিক দ্বারা শেষ করা। 'মার্ডার ইনকো' নামক পুস্তকে নেতৃস্থানীয় গ্যাং মেম্বারদের নাম উল্লেখ আছে। তৎকালীন এটর্নি জেনারেল টমাস, ই ডিউ-এর দেয়া তালিকায় তাদের মূল নাম ও সাংকেতিক নাম এভাবে উল্লেখ আছে। ম্যাক্স 'দি জার্ক' গলব্, জ্যাকব, 'হফস্কী' রথম্যান, 'ডপে বেন্নী' ফেইন, 'বাগসী' গোল্ডস্টেইন, মিকী, কোহেন, 'বাগসী' সাইগেল, 'ফ্যাটসিডনী' ব্লাজ এবং অ্যাল্লি 'টিকটক' ট্যানেন বাউম।

আজকের দুনিয়ায়ও সুসংগঠিত যত অপরাধ কর্ম ঘটে, তার মূলে রয়েছে এই ইহুদী চক্র। ২৩শে এপ্রিল (১৯৭৬) লন্ডন ইভিনিং স্টান্ডার্ড পত্রিকায় প্যারিসে ইহুদী চক্রের সন্ত্রাস সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ আছে। উত্তর আফ্রিকা থেকে আমদানীকৃত

www.pathagar.com

ইহুদী মাফিয়া কিভাবে করসিকান মাফিয়া চক্রকে বহিষ্কার করে, তাও ইতিহাসে উল্লেখ আছে। আলজিরিয়া তার স্বাধীনতা লাভের আগে ইহুদী চক্র সে দেশে কি ভীষণভাবে তৎপর ছিল তাও কারো অজানা নয়। প্যারিসে কর্মতৎপর ইহুদী মাফিয়ার প্রধান এবং তার পরিবার প্যারিস কাফেতে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়। তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠান যেভাবে জাঁকজমকের সাথে সম্পন্ন হয়েছিল, তা নজিরবিহীন। মাথায় আঁট টুপি পরিহিত শত শত সমর্থক এ অনুষ্ঠানে যোগ দেয়।

এন্টি সেমিটিজম আন্দোলনের উদ্যোক্তা হলো ইহুদী। এন্টি সেমিটিজম আন্দোলনকে জিইয়ে রাখার জন্য ১৯৫৮ সালে বিশ্ব ইহুদী সংস্থার প্রেসিডেন্ট ড. নাহুম গোল্ডম্যান বিশ্বের ইহুদীদের সতর্ক ও সচেতন করে দেন। ইহুদীবাদের জনক থিওডর হারজল এন্টি সেমিটিক আন্দোলনের উদ্যোক্তাদের সঙ্গে এক চুক্তিতেও আবদ্ধ হন। এদিক দিয়ে ইহুদীরা হিটলারকেও সমর্থন করে। ১৯৩৭ সালে এন্টি সেমিটিক পল সরকার মাইকেল লেপেকিকে ইহুদী কমিউনিটি প্রতিনিধিকে সাথে দিয়ে পাঠিয়েছিলো মাদাগাস্কারে। উদ্দেশ্য ছিল এই, মাদাগাস্কারের অবস্থা পর্যালোচনা করে দেখা। যদি অবস্থা অনুকূল হয় তাহলে পোলান্ডের সকল ইহুদীকে মাদাগাস্কারে প্রেরণ করে সেই দেশকে একটি ইহুদী রাষ্ট্র হিসাবে গঠন করা। এই প্রস্তাবের মূল ব্যক্তি ছিলেন হারজল। এ প্রস্তাব নাজী সরকারও সমর্থন করে। ১৯৩৮ সালে খোদ হিটলারও একমত হয়েছিলেন যে, তিনি রাইখস ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট ড. হালমার চাটকে লন্ডনে পাঠাবেন লর্ড বিয়ারস্টেড এবং মি. রুবলীর সঙ্গে এ ব্যাপারে আলাপ-আলোচনার জন্য। কিন্তু ব্রিটিশের আপোষ বিরোধী মনোভাবের কারণে পরিকল্পনা ভেঙ্গে যায়। নেসেটের ৩০/৬/৫৯-এর কার্য বিবরণীতেও উল্লেখ আছে যে, ইহুদী লীডার হেইম আরলসরফ নাজীদের সঙ্গে এ ধরনের একটি চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন।

মজার ব্যাপার হলো এই, প্রথম দিকে হিটলার প্রচুর অর্থ পেতেন ইহুদীদের থেকে। I paid Hitler পুস্তকের প্রণেতা টাইসসেন লিখেছেন, ইহুদী নেতা

www.pathagar.com

সাইমন হিরিশ ল্যান্ড ইজেনের ব্যাংক থেকে যথেষ্ট অর্থ সরবরাহ করেছেন। আরও বহু কাহিনী আছে ইতিহাসে লেখা। হিটলারের সঙ্গে ছিল ইহুদীদের সখ্যতা, কিন্তু মহাযুদ্ধ সবই ওলট-পালট করে দিল। আইকম্যান সম্পর্কে ইহুদীরা নানা কথা বলে, কিন্তু আইকম্যান যে একজন পাক্কা ইহুদী ছিলেন, তা হয়তো অনেকেই জানেন না। ইহুদীরা চক্রান্তকারী জাতি, সন্ত্রাসী জাতি, অন্তর্ঘাত সৃষ্টিকারী জাতি এবং যে কোন জাতির বা সংস্থার মধ্যে তারা মিশে যেতে পারে। কমিউনিস্ট আন্দোলনে কমিউনিস্ট হিসাবে ছিল, ক্যাপিটেলিস্ট সমাজে তারা ক্যাপিটেলিস্ট হিসাবে কাজ করে আর ইসলামের দুশমনী করার জন্য মুসলমানকে ক্রয় করে মুসলমানদের মধ্যে মিশে অন্তর্ঘাতমূলক কাজ চালায়। সামরিক জান্তায়ও তাদের উপস্থিতি রয়েছে। বড়ই ভয়ংকর এই জাত।

www.pathagar.com

বন্ধুর প্রশ্ন, জাম্বিল-টাম্বিল কেন? আধুনিক যুগের এই ডিসকো দশকে তুমি ব্রীফকেইস হাতে না নিয়ে পুরানো জামানার জাম্বিল কেন কাঁধে ঝুলিয়েছ? জাম্বিল তো ব্যবহার করে থাকে ভিখারী, বাউল, হিপ্পী বা আধ-পাগল লোক। তুমি তো এর কোন একটিও নও। আমি বললাম, দেখ দোস্ত, ব্রীফকেইস না নিয়ে জাম্বিল নেয়ার পিছনে চারটি কারণ রয়েছে। প্রথম কারণ হলো, এই ব্রীফকেইস আজকাল হাতে নিয়ে চলাফেরা করা বড় রিস্কী ব্যাপার। সর্বদা ব্রীফকেইস হাইজ্যাক হচ্ছে। হাইজ্যাকাররা ভাবে, ব্রীফকেইসগুলো টাকার এক একটি জলন্ত সিন্দুক। জাম্বিলের প্রতি কিন্তু তাদের আকর্ষণ মোটেই নেই। জাম্বিল-কাঁধে চলমান মানুষকে তারা ভাবে ফকির, আধ-পাগল, তাই কাছে ভিড়ে না। এ জন্য নিরাপদে পথ চলা যায়। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, আমি ব্রিটিশ আমলের মানুষ। সে আমলে জাম্বিলের খুব প্রচলন ছিল। সেই জাম্বিল বোধ হয় আমার মন-মানসে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে। তাই, একালে বাস করেও সেকালের একটি স্মৃতিকে ধরে রাখতে চাই। বাংলাদেশের ডাক বিভাগ কত আধুনিক হয়েছে; কিন্তু পুরানো দিনের রানারের ঝুলি বা জাম্বিল আর লাঠি ডাকবিভাগের প্রতীক হিসাবে সগৌরবে এযুগেও ব্যবহার হচ্ছে। আমিও কোন এক ভাবে স্মৃতিময় অতীতকে ধরে রাখতে চাচ্ছি। তৃতীয় কারণ, জাম্বিল কাঁধে থাকে, তাই দুহাত থাকে মুক্ত। ব্রীফকেইস এক হাতকে অকেজো করে রাখে, আপদে-বিপদে দুহাত ব্যবহার করা যায় না। জাম্বিল ব্যবহারে কিন্তু সে সুবিধা আছে। চতুর্থ কারণ, দুনিয়ার এই মোসাফির জীবনে জাম্বিলকে প্রয়োজনে বালিশ হিসাবেও ব্যবহার করা যায়, ব্রীফকেইস ব্যবহারে কিন্তু সে সুযোগ নেই। আমার এসব কথা শুনে বন্ধু তার ব্রীফকেইস শক্ত হাতে ধরে এদিক-ওদিক তাকিয়ে চুপে চুপে বললেন, থাম তো তুমি, আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, জাম্বিলই ভাল। তোমার কথাবার্তা শুনে আমার ভয় হচ্ছে। আমার ব্রীফকেইসের ওপর কোন মাস্তানের নজর পড়লো কিনা, তা আল্লাহই ভাল জানেন।

Design : Safwan Digital Graphics, Mobile : 011-065690

একমাত্র পরিবেশক
তাসনিয়া বই বিতান
৪৯১/১, ওয়্যারলেস রেলগেট
বড় মগবাজার, ঢাকা
ফোন : ৮৩৫৪৩৬৮, ০১৭২-০৪৩৫৪০